কোরা কাগজ

সপ্তর্ষি
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

কোরা কাগজ

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
৩ জানুআরি ১৯৬৩

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ
দেবাশীষ রায়

কোরা কাগজ

পাঁচ-সাত-আট মিনিট, যতক্ষণ গোটা ব্যাপারটা চলে, চোখ সরাতে পারি না। দেখতেই হয়! কিন্তু তারপরই খারাপ লাগে। খারাপ লাগে ওই মহিলার জন্য। মনে হয় যেন ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ওকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যেও দুটি শরীরের অন্তরঙ্গতা স্পষ্টই বোঝা যায়।

দেখতে খারাপ লাগে, তবু দেখি! একটা মহিলা অবয়ব চোরের মতো পা টিপে টিপে হাঁটে। আলো না-জ্বেলে দরজা খোলে। বাথরুমে যায়। আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, এখানে আমার না আসাটাই ভাল ছিল অথবা ঘুমিয়ে কাদার তাল হয়ে থাকা উচিত ছিল।

উঠোন পেরিয়ে কলতলা। তারপাশে বাথরুম। মহিলাকে খেয়াল রাখতে হয় যেন কেউ জেগে না-ওঠে। কলতলায় জল পড়ার শব্দ হলে চলবে না। বালতি টানা চলবে না। চুপি চুপি সে কল টেপে।

তিন শরিকের পুরনো দালান বাড়ি। প্রত্যেকের ভাগে পড়েছে একটা করে বড় শোবার ঘর, আর দুটো করে ছোট ছোট ঘর। বাথরুম, কলতলা আলাদা হয়নি। হাত আর পাশবালিশের ফাঁক দিয়ে আমি দেখছি। কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, যে আমি জেগে আছি।

বাথরুম থেকে ঘুরে মহিলা আমি যেখানে শুয়ে আছি সেদিকে তাকান। যেন কিছু পড়ে নিতে চান। কান খাড়া করে রাখি। কোনও শব্দ করি না। মুখ দেখতে পাই না। অবয়বে বুঝতে পারি সঞ্জয়ের কাকিমা। আমাকে যেখানে শুতে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ওদের শোওয়ার ঘর স্পষ্ট দেখা যায়, সেটা ওদের কারও খেয়াল নেই।

সঞ্জয়দের বাড়িতে এর আগে বহুবার এসেছি। তবে কখনও রাত্রে থাকিনি। এই প্রথম রাত্রিবাস। ওর বোন পৃথা। এক সঙ্গে আমি সঞ্জয় আর পৃথা এখানে 'বাণী' সিনেমায় ছবি দেখতে গিয়েছি। পৃথা বসেছে আমার পাশে। সারাক্ষণ বসে কেবল উসখুস করেছে। জানি না কেন। এরকম সুযোগ পেলে ছেলেরা নাকি মেয়েদের বুকে হাত দেয়। আমার সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। বড় অস্বস্তি করে। মনে হয় সামনে বসে থাকা লোকগুলোর পিছনেও দুটো করে চোখ রয়েছে। ওরা সবাই সিনেমা নয়, আমাদের দেখছে।

পৃথা ভালবাসার কথা বলে। সত্যি কি মিথ্যে জানি না।

ওর চোখের চাউনি মাঝে মাঝে বদলে যায়। কীরকম নরম আর মায়াবী হয়ে ওঠে। গলার স্বরটাও তখন হয়ে যায় খুব সুরেলা।

পৃথা খুব ফর্সা। নরম নরম, নাদুস নুদুস। পৃথার মা-কাকা-কাকিমা এর মধ্যেই ওর বিয়ে নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন। পাড়ার ছেলেরা কলেজ যাতায়াতের পথে ওকে নানা রকম আওয়াজ দেয়। অবশ্য এখন ওটা কমেছে। সজল বলে একটা ছেলে ওর সঙ্গী হয়েছে আজকাল।

সজল পার্টি করে। পার্টির নেতা সুভাষদা সজলকে খুব স্নেহ করে। সেই সুবাদে সজলের থেকে বয়সে বড়রাও এখন ওকে দাদা বলে। ওর সম্পর্কে সঞ্জয় আমাকে অনেক কিছু বলতে চায়। কিছুদিন আগে এদিকে একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেছে। সেই ঘটনাটা সঞ্জয় আমার কাছে বলেছিল। পৃথা লাশ দেখতে গিয়েছিল। এসে কলতলায় বমি করেছিল। পৃথার সন্দেহ, এই খুনের সঙ্গে সজলের যোগাযোগ আছে। আর সজলের পাল্লায় পড়ে পৃথা হয়তো কোনওদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে।

অবশ্য এরকম একটা ঘটনা যে ঘটেছিল আড়ালে আবডালে আমার কানে এসেছে। তবে আমাকে সঞ্জয় বা পৃথা কেউই বলেনি।

যাদবপুরে পড়তে এসে সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ। তথ্য ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছি। সঞ্জয়ও একই সঙ্গে ভর্তি হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ছেলে। আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে। আলে কালে বাড়ি যাই। না-যেতে পারলেই যেন ভাল হয়। মাথার ওপরে কেবল দাদা। গ্রামে থাকে। পড়ার খরচটুকু পাঠিয়ে দেয়। ব্যস বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বলতে গেলে এইটুকু।

সময় ও সুযোগ এলেই চলে আসি জয়নগর মজিলপুরে। এখানেই সঞ্জয়দের বাড়ি। ওর সাথে ঘুরি এদিকে। তা ছাড়া দুজনে একসাথে পড়াশোনাটাও করা যায়। সঞ্জয় বাড়ি থেকে যাদবপুর যাতায়াত করে। কলকাতায় কোনও কাজ থাকলে বা প্রয়োজন হলে যাদবপুরে হস্টেলে আমার ঘরে থেকে যায়।

মাঝে মধ্যেই ওদের বাড়ি আসি। এবারে ওদের বাড়ির গেটে পৃথাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলাম। দুটো অচেনা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। ওদের দেখে সঞ্জয়ও যেন কেমন হয়ে গেল।

পৃথাকে এভাবে দেখে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এত জোরে ধকধক করছিল যে মনে হচ্ছিল পাশে সঞ্জয় বোধ হয় শুনতে পাবে। মনে পড়ছিল ওর পুরনো কথাগুলো। ওর অল্প অল্প ছোঁয়া। একটু একটু রাগ হচ্ছিল পৃথার উপর।

ছেলে দুটো অসভ্যের মতন ওর সারা শরীরের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। ওদের চোখে ফুটে উঠছিল ওরা কী চায়। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছিল না। আমাদের দুজনকে দেখেও পৃথা হেসে হেসে কথা বলছিল ওদের সঙ্গে।

কী রে যাবি তো?

একজনের গলা শুনলাম। পৃথার গলায় সরু সোনার চেন, সাধারণত মেয়েরা যেমন পরে। এরকম হার ওর গলায় আগে কখনও দেখিনি।

ছেলেটা বলল, কাল 'বাণী'র সামনে দাঁড়াবি। ম্যাটিনি শো।

পৃথা কী যেন বলল। শুনতে পেলাম না। আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বুকের ভিতর একটা ব্যথা চিনচিন করছিল। অবশ হয়ে যাচ্ছিল গোটা শরীর। মনে হচ্ছিল পা দুটোর ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

মাসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। মাসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ট্রেনে এলে? আগে খবর দাওনি তো? যাও ভেতরে যাও। সঞ্জয়ের কাকিমা ঠাকুর ঘরে আছে। ওর পুজো হলে চা পাঠাচ্ছি।

চুলগুলো সব পেকে গেছে। বিশাল চেহারাটা বয়সের ভারে কিন্তু ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি।

পৃথা সঞ্জয়ের চেয়ে তিন বছরের ছোট। বন্ধুর বোন হিসেবে পৃথার সঙ্গে একটু প্রেম ট্রেম করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

ঠাকুরঘরে বেশ একটা হাসিখুশির ব্যাপার চলছে মনে হল। এ বাড়িতে পুজো-আচ্চা, ব্রত-পার্বণের একটা বাতিক আছে। বাড়ির ছেলেমেয়েরা অবশ্য কেউ ওসবের ধার ধারে না। কাকিমার পুজো-টুজো নিয়ে ওরা খুব মজা করে।

মাসিমা কী যেন বলতে বলতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। দাওয়ায় বসে জুতো খুলছিলাম। সঞ্জয়ের কাকিমা এক ফাঁকে আমাকে দেখে গেলেন। আমায় অবশ্য দেখবার কিছু নেই—এ বাড়িতে আমি পুরনো মুখ। তবু হয়তো বাইরের লোক বলে কৌতূহল মেটালেন।

আমাদের চা-খাওয়ার অনেক পরে পৃথা এল।

কাল কলেজ নেই?

সঞ্জয়ের জিজ্ঞাসায় এমন কিছু ছিল, যা বুঝিয়ে দেয় পৃথার সঙ্গে ওর ব্যবহার আর ঠিক আগের মতো নেই।

কেন?

পরীক্ষা-টরিক্ষা নেই?

এখন আবার কিসের পরীক্ষা?

বুঝতে পারলাম রাগের মাথায় সঞ্জয় ভুল প্রশ্নটা করে ফেলেছে। মাসখানেক আগেই ওর ফার্স্ট ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে।

আমার দিকে চেয়ে পৃথা হাসল।

তবে তো ঠিকই আছে। তাহলে যাও। এমনি করে পরিবারের নামটা ডোবাও।

সঞ্জয় হতাশ গলায় কথাটা বলে বেরিয়ে গেল। আমার খুবই খারাপ লাগছিল। কিন্তু কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

পৃথা গলা নামিয়ে বলল, তপনদা, আপনি দুদিন থাকবেন তো? আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

অনেক কথা না ছাই! প্রতিবারই দেখা হলে তুমি এরকম কথা বলো। তারপর কোনও কথা না-বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ো অন্য কাজে। মনে করিয়ে দিলে বল, আজ রাতে বলব। সারা রাত আমার এমনি জেগে কেটে যায় তোমার কথা শোনার অপেক্ষায়।

শুনেছি তো অনেক কথাই। এই তিন মাসে তোমার সম্পর্কে অনেক কথাই কানে এসেছে। সবটা বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হয় তুমি আগের মতোই আছো। কিন্তু আজ তোমাকে এ কী রূপে দেখলাম? মনের মধ্যে এমনি অনেক কথাই গুনগুন করে, বলতে পারি না। ওকে শুধু জিজ্ঞাসা করি, পৃথা তুমি পাল্টাওনি তো?

আমাকে বিড়বিড় করতে দেখে পৃথা ঘুরে দাঁড়ায়।

কিছু বললেন?

না।

রাত্রে আসব।

রাত মানে কত রাত? জিজ্ঞেস করা হল না। পৃথা চলে গেল। ওই ছেলে দুটোই

বা কে? ওদের মধ্যেই কি একজন সজল? হঠাৎ একটা আচমকা ভয় কাঁপিয়ে দেয় ভেতরটা। তা হলে পৃথা সম্পর্কে যা-যা শুনেছি। সে সব সত্যি?

ঘরের বাইরে এলাম। রান্নাঘরে সঞ্জয় মাসিমার সাথে কী সব আলোচনা করছে। ওদের কথাবার্তার সুরটা ভাল ঠেকল না।

এককালের বনেদি পরিবার এদের। এখন ভগ্নদশা! আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। সঞ্জয়ের বাবা এ বাড়ির বড় ছেলে। ওঁরা তিন ভাই। বাড়ি তাই তিন ভাগ হয়েছে। সঞ্জয়ের বড়কাকা এখানে থাকেন না। সোনারপুরে বাড়ি করেছেন। তবু নিজের ভাগের অংশ তালা দিয়ে গিয়েছেন। ছোট কাকা নিঃসন্তান। বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন। লোকের বাগান দেখাশোনার কাজ করেন। নিজেদেরও বাগান আছে। ডাব, বিলিতি আমড়া, সফেদা, পিয়ারা, আম, লিচু, জাম এসব গাছ আছে। আর পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন সখের থিয়েটারি। জয়নগরের 'রূপ-অরূপ' মঞ্চে যত বড় বড় থিয়েটার হয়েছে তা ওঁদের দলের। সঞ্জয়ের দাদু রামমোহন চরিত্রে এত ভাল অভিনয় করেছিলেন যে সিনেমায় ওঁর ডাক পড়েছিল। বেশ কয়েকটি সিনেমাতে অভিনয় ও চিত্রনাট্য লেখায় তাঁর ভূমিকা ছিল। আর সেটাই এ বাড়ির কলঙ্কিত ইতিহাস।

সঞ্জয়ের কাছে খুব অল্পই জেনেছি। ওর দাদুর লেখা চিত্রনাট্য ছবিও হয়েছে। গল্প লেখার হাত ছিল নিপুণ। সে সব লেখা এখনও খুঁজলে বাড়ির আনাচে কানাচে পাওয়া যেতে পারে। মানুষটার প্রতি অশ্রদ্ধা, তাঁর লেখার প্রতি পরিবারে কোনও মোহ তৈরি করেনি। লেখাগুলো অপ্রকাশিতই থেকে গিয়েছে। এই লেখা উদ্ধার আমার কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ। কিন্তু আমি কোথায় খুঁজব? যদি না এরা হাতে তুলে দেয়।

এই তিন মাসে পৃথা কিশোরী থেকে নারীতে পাল্টে গিয়েছে। এমন কী কাজ করল ও যে এত্ত বড় হয়ে গেল? আসলে সঞ্জয় যেটা বলেছে, সেটাই ঠিক। বয়ঃসন্ধির ভয়। মেয়েদের এটা হয়। একটা সময় বয়সটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। শরীরটা পাল্টে যায়। সবাই পৃথাকে এখন ভয় পাচ্ছে। এতে কোনও ভালবাসা বা সম্মান নেই। আতঙ্ক আছে। গলার কাছে তেতো তেতো লাগে। কষ্ট হয়। কিছু না করতে পারার কষ্ট। অসহায় লাগে সঞ্জয়ের জন্য।

মেয়েদের শরীরের ব্যাপারটা ততক্ষণই মজার, যতক্ষণ না বিপদ ডেকে আনে। আমাদের ঘরে একটা বয়স পর্যন্ত মা, পিসিমারা পাখিপড়ার মতো মেয়েদের কানের কাছে বলে, সাবধান, তুমি মেয়ে। সাবধান, একবার পা পিছলে গেলে আর টেনে তোলা যাবে না। ছেলেরা গায়ে হাত দিলেই বিপদ হতে পারে। কী বিপদ, তার ভয়াবহতা কতটা, মেয়েরা কিছুই তখন জানে না। শুধু জানে, মেয়ে মানেই অজস্র নিয়মকানুন। নিজেদের বাঁচানোর জন্যই সেইসব নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়।

কী করা যায়, কী করে পৃথাকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়, কিছুই ঢুকছিল না মাথায়। পৃথা কিছুদিন থেকে মরিয়া হয়ে উঠছিল। বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

ওর এই ব্যবহারে মনের মধ্যে একটা জেদ চেপে যায়। মনে হয় পৃথাকে ওই দুটো ছেলের কাছ থেকে, ওই সজলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব। মনে হচ্ছে পৃথার সামনে বিপদ আসছে। ও যাদের সঙ্গে ঘোরে তারা ওর বন্ধু নয়।

কিন্তু কোথায় পৃথা? পৃথার অপেক্ষায় থেকে থেকে রাত জেগে এ আমি কী দেখলাম? আলতো করে চোখ খুললাম। খুব সাবধানে উঠে বসলাম। এখন কোথাও কোনও কিছু নড়াচড়া করছে না। সঞ্জয় ওর নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত এ ঘরে আমরা গল্প করেছি। এ বাড়িতে এখনও টিভি ঢোকেনি। আর্থিক সমস্যার জন্যই বোধহয়। সঞ্জয়ের ছোট কাকার ঘরও এখন নিস্তব্ধ। রমণ সুখের গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়েছে স্বামী-স্ত্রী যুগলে।

আমি পৃথাকে বাঁচাতে চাইছি। অথচ পৃথা বাঁচতে চায় কি না আমি জানি না। পৃথা কি আমাকে ঠকাচ্ছে? বুঝতে পারি না।

পরের দিন সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলে ওকে বুঝিয়ে 'বাণী' সিনেমার সামনে এসে দাঁড়ালাম। পৃথা বাড়িতে। সঞ্জয়ও বাড়িতে। এখানকার লাইব্রেরিটা দেখব বলে বের হয়ে এসেছি। কাল সারারাত ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনায় ঘুম হয়নি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। মনে মনে অনেক কথা সাজিয়েছি পৃথাকে বলব বলে। ওর সাথে সকাল থেকে একটাও কথা বলিনি। দেখিয়েছি আমার রাগ হয়েছে।

কিছু পরে দেখি পৃথা আসছে। এগিয়ে যাই। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে একটা মারুতি ভ্যান এসে দাঁড়াল। জানালায় একটা মুখ দেখলাম সামান্য বের হয়ে এল।

মারুতির দরজা খুলে গেল। আমার পাশ দিয়ে কালো কাচ তুলে মারুতি ভ্যানটা পৃথাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। যেন একটা বিরাট বাজপাখি ছোট্ট খরগোসকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল। নিমেষে গাড়িটা হারিয়ে গেল। এখন ওটা বিষ্ণুপুরের দিকে যাবে, না উল্টো দিকে—কিছুই জানি না।

আমার পিঠে একটা হাত পড়ল, দেখি সঞ্জয় এসে দাঁড়িয়েছে।

চল। বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। স্টেশনের ধার বরাবর জংলা বুনো গাছগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছি। সাদা ফুলে লাল হলুদের ছিটে। ধুতরো আকন্দ ফুটে আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডুমুর গাছ। লেভেল ক্রসিং ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে এগোতেই পানাপুকুর। বেগুনি রঙের ফুল সবুজ জলার শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসব দেখব কি? আকাশ ঢেকে আসছে ঘন কালো মেঘে।

সঞ্জয়কে দেখে মনে হচ্ছে পৃথাকে পেলে এক্ষুনি গলা টিপে শেষ করে দেবে। এখন গাড়ির সময় নয়। প্ল্যাটফর্ম খালি। শেডের নিচে কয়েক জন তাস খেলছে। অল্পস্বল্প রোদ ঝলমল করছে। দুজনে তাই স্টেশনের নাম লেখা বোর্ডের ছায়ায় বসলাম। প্ল্যাটফর্মে কোনও বড় গাছ নেই। সরু প্ল্যাটফর্ম, মাথা ন্যাড়া।

ওপাশে উল্টোদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুপুরি, খেজুর গাছ। একটা আমগাছও আছে। সঞ্জয় কোনও কথা বলছে না। আমি কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। তাই চুপ করে আছি। ও হয়তো আমার ওপর অনেক আশা করেছিল।

অনেকক্ষণ পর ও হঠাৎ ভেঙে পড়ল কান্নায়।

কী হবে বল তো?

ভেঙে পড়িস না। বাড়ি আসতে দে। আমিও কথা বলব। মাথা ঠাণ্ডা রাখ।

ওকে স্তোকবাক্য দিই। কিন্তু এসব কথায় কি হবে আমি নিজেই জানি না। সন্ধ্যা নামছে ঝুপ ঝুপ করে। পাখিগুলো সুড়ুৎ ফুড়ুৎ এসে বসছে ঝোপঝাড়ে। রাতে

ঝোপঝাড় পানাপুকুরের আশপাশ একেবারেই বদলে যায়। পূর্ণিমা না হয়ে অমাবস্যা হলে তো আর কথাই নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার। কোথায় পুকুর আর কোথায় আমগাছ—কিছুই দেখা যায় না।

চল। এবার বাড়ি চল। ওকে ঠেলা দিলাম। কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়াল সঞ্জয়। ফের রেল লাইন ধরেই হাঁটা সুরু করল। একবার বিষ্টুপুর থেকে রেললাইন ধরে চৈত্রের দুপুরে হেঁটে এসেছিলাম। কত যে বিষধর সাপ কাটা পড়ে ছিল দেখেছিলাম মনে নেই। মনে আছে সাপগুলোর কাটা পড়া বীভৎস দেহগুলোর চেহারা। তাই এদিকে আসতে চাইছিলাম না। কিন্তু এখন ওকে বাধা দিতে পারলাম না। রেল লাইনের পাতদুটো চকচক করে। কত মৃত্যু, কত আত্মহত্যার সাক্ষী এই পাত দুটো। তবু কোথাও নেই এতটুকু রক্তের দাগ। চকচক করছে। দূরে কোথাও ওইখানে মিলে গেছে। অথবা শেষ হয়ে গিয়েছে।

জমাট অন্ধকার কালো পাহাড় হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জোনাকি পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। ঝিঁঝির কলতান, মাঝে মাঝে দু একটা অদ্ভুত স্বর, বোধহয় সোনা ব্যাঙের। মন ভাল থাকলে সঞ্জয় বলতো—এটা ব্যাঙের ডাক, সোনা ব্যাঙ। এদিকে সোনা ব্যাঙ কমে আসছে। ব্যাঙ ধরে ধরে সব বিদেশে চালান দিচ্ছে। এদের মাংস নাকি খুব সুস্বাদু। তাই এর বিনিময়ে ডলার আসছে দেশে।

বাণী সিনেমার পাশ দিয়ে গলিটুকু পেরিয়ে গেলেই সোজা রাস্তা। দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে এসে চক্রবর্তী পাড়ায় ঢুকে পড়া যায়। এঁকে বেঁকে সোজা পশ্চিমে গেলে আবার বড় রাস্তা পাওয়া যায়।

বাঁ দিকে দুটো বড় বড় বাড়ি। ডান দিক বরাবর ছোট ছোট দোকানের সারি। ছোট টিনের চালার নিচে খোকনের তেলেভাজার দোকান। এই দোকানের নামডাক আছে। শীতকালে ভোর থেকে ভিড় জমে। গরম তেলের ওপর বেগুনিগুলো ফুলতে সময় দেয় না। খদ্দেররা ছেঁকে ধরে চারধার থেকে। সবাই বলে আমাকে আগে দাও। তারপর সারি সারি সব মোয়ার দোকান।

ধন্বন্তরী কালীমন্দিরের পাশ দিয়ে ফেরার পথে চাতালে উঠে সঞ্জয় খুব মন দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করল। ওর দেখাদেখি আমিও। ছোটবেলা থেকেই কালীমূর্তি দেখে ভয় পেতাম। চোখ বুজলেই দেখতে পাই একমুখ রক্ত খেয়ে জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সব ভয়ের শিকড় বুকের ভেতর অনেক গভীরে চেপে বসে আছে এখনও। তাই কারও সঙ্গে তর্কে যাই না।

চুপচাপ বাড়ি ঢুকলাম দুজনে।

হাত-পা ধুয়ে সঞ্জয়ের ঘরে গিয়ে বসলাম।

খোকা একবার আয় তো।

মাসিমা সঞ্জয়কে ডাকলেন। মাসিমাকে যতই দেখি ততই অবাক হই। অসীম ধৈর্য। সব ঝড় সামলাচ্ছেন। মেয়ের জন্যে দুঃখে বুক ফেটে যায়। মাঝে মাঝে সঞ্জয়ও বলে দু-চার কথা। পৃথাটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। সব দোষ যেন ওঁর।

কী ভাবছেন? একা একা এখানে বসে?

একটা নতুন গন্ধ নিয়ে পৃথা হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকল। হালকা সেন্টের গন্ধ! অনেক দিন পরে এলেও মনে পড়ল না ওর কোনও পারফিউম ছিল।

কোথায় গিয়েছিলে?

বিষ্ণুপুরে।

সেখানে কী আছে?

জানেন না?

নাঃ।

দারুণ জায়গা। মহাশ্মশান—পাশে একটা বিদ্যুতিক চুল্লী করেছে।

তোমার বেড়াবার জায়গাটা তো বেশ।

কেন? শ্মশান খারাপ জায়গা নাকি?

কী উত্তর দেব? একজোড়া টগবগে যুবক-যুবতী দিনের পড়ন্ত আলোয় শ্মশানে বসে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন বুনছে—এ আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না।

মুখে কিছু বলি না। বলি, এখনই ফিরলে?

না, না। অনেকক্ষণ হল ফিরেছি। দেখি আপনি নেই, দাদাও নেই যে জিজ্ঞেস করব। কোথায় গিয়েছিলেন?

আমার দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাতে পৃথা অবাক হয়ে তাকায়। গলা নামিয়ে বলে, সরি।

আমি বলি, না ঠিক আছে। তুমি তো এখন বড় হয়েছ! এবার বল, তুমি কী বলবে বলেছিলে?

পৃথা কথা ঘোরাল, এখানকার লাইব্রেরি কেমন লাগল?

উঁহু, আমি যা জিজ্ঞেস করলাম, তার উত্তর দাও।

ওকে একবার ভাল করে দেখলাম। সত্যিই তো ওকে দেখতে মোটেই খারাপ নয়। গলায় চিকচিক করছে সোনার চেন। চুল বেশ লম্বা। বড় বড় চোখের পাতা। হাতের কব্জিতে একটা দামী ঘড়ি বাঁধা। ওকে তো ঘড়ি পরতে দেখিনি আগে। হঠাৎ মনে হল, নাঃ, সত্যিই ও বদলে গেছে।

আমার চোখের ভাষা বোধহয় পড়ে ফেলল পৃথা। কাছে এসে সরে যাওয়া বুকের কাপড় টেনে নিয়ে বলল, আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরিহু এত ভয় কিসের? সাহসী লোকেরাই দুনিয়া চালায়—বুঝলেন? আমি জানি সজল আমাকে ব্যবহার করছে। কাজ মিটলে ও হয়তো আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তবে তার আগে আমি গুছিয়ে নেব... আমাকে কেউ চেনে না। বি. এ. পাস করার পরই যাতে স্কুলে টিচারি পেয়ে যাই সেজন্য ও বলে রাখবে সুভাষদাকে। পার্টির কোটা থাকে। সুতরাং আমি চাকরি পাবই।

ওর চিবুকে দৃঢ়তা! চোখে-মুখে এক বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়া। পৃথা ঠিক করে ফেলেছে এই রাস্তা থেকে সরবে না।

কষ্ট পাই, কারণ এই পৃথাকে আমি আগে কোনও দিন দেখিনি। পৃথাকে সজলেরা এতটাই বদলে দিয়েছে।

সরকারের ক্ষমতা আছে, এখন সরকার যে দলের সজল সেই পার্টি করে, তাই হয়তো ওকে চূড়ায় তুলে নেবে সজল। কারও তোয়াক্কা না করে, এগিয়ে যাবে ও,

ওপরে উঠে পড়বে। এক এক সময় আমারও মনে হয় সজলরাই বোধ হয় ঠিক। দিনে দিনে চারপাশের যা চেহারা হচ্ছে। পৃথার লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। একটা চাকরির জন্য সজল যা করতে বলবে, ও তাই করবে। যে সব বিষয় ভাবতে চাই না, সেই সব বিষয় জোর করে আমার মনের ভেতর এসে ঢুকে পড়ে।

তখন থেকে কী ভেবে যাচ্ছেন? কোনও কথা বলছেন না?

খেয়াল হল সত্যিই অনেকক্ষণ কোনও কথা বলিনি। ক্লান্ত গলায় বললাম, না, কিছু নয়।

তবে।

শুনছি। তুমি খুব ভাল অঙ্ক কষতে পারো পৃথা। জীবনের সব অঙ্ক যদি এভাবে মিলে যায়, তবে তো খুব ভাল কথা! আর যদি না মেলে, তাহলে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে।

পুরুষের তৈরি ধর্ম আর শৃঙ্খল ভাঙতে গেলেই, লোকে মেয়েদের নষ্ট বলে। যেহেতু পান থেকে চুন খসানোর পক্ষে আমি, তাই নিজেকে নষ্ট করতে ভালবাসি। বুঝলেন? সমাজের চোখে 'নষ্ট' না হলে কি কোনও নারী নিজেকে 'মানুষ' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে?

নিশ্চয় পারে। আমাদের দেশে সেরকম কোনও উদাহরণ কি তুমি দেখতে পাও না?

না। পাই না। পেলেও অত কৃচ্ছ্রসাধনের সময় আমার নেই। আমি চাই জীবনটাকে ভোগ করতে।

পৃথা আর দাঁড়ায় না। চলে গেল। সোনার চেন, দামী হাতঘড়ি, সেন্ট, সজল এসব ওকে দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে? সবাইকে তো দেয় না! বুঝতে পারলাম পৃথা এখন গুছিয়ে নিচ্ছে। একতলার এই লম্বা ঘরটা বাড়ির একদম শেষে। রাস্তার দিকে পাশাপাশি দুটো জানালা আছে। খড়খড়ি আর কাচের পাল্লা দুটোই এক সময় ছিল। এখন কাচের পাল্লাটা নেই। পুরো দরজার সাইজে জানালা দুটো। জেলখানার মতো গোলশিকগুলো ক্ষয়ে গেছে মাঝখানে। ওগুলো যেন সনাতনী নৈতিকতার ক্ষয়িষ্ণু প্রতীক হয়ে টিকে আছে। ঘরের মেঝে চুন দিয়ে পেটানো। পালিশ হয়নি। আসবাব বলতে সাবেক ডিজাইনের ভারি একটা আলমারি। আর একটা সেলাই মেশিন, এই খাটটা, কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা পরে রয়েছে খাটের নিচে। ঘরের কোণে রাখা কটা হ্যাজাক লাইট।

এই হ্যাজাক লাইট এ বাড়ির কত রোশনাই-এ আলো জ্বেলেছে তার লেখাজোখা নেই। আজ পড়ে আছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে এক কোণে। মানুষের জীবনও বোধহয় এরকমই। যখন প্রয়োজনীয় তখন নানা রঙের ঢেউ খেলা করে। যখন অপ্রয়োজনীয় তখন অবহেলা, আস্তাঁকুড়, এক কোণে একক অস্তিত্ব!

সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। ইল্‌শেগুঁড়ির মতো। হালকা একটা হিম হিম ভাব রয়েছে এই বৃষ্টিতে। তবু ভাল লাগে এই হিমানী বৃষ্টিকে। অনেক লোক রাস্তায় হাঁটছে। কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে। ওদের হয়তো খুব তাড়া আছে। আমার নেই। রিমঝিম বৃষ্টিতে হাঁটছি। সামনেই শিবনাথ শাস্ত্রী স্মৃতি পাঠাগার, এখানকার লাইব্রেরি।

একটা গাড়ি এসে থামল আমার পাশে। লাল রঙের মারুতি। সজল নয়, এ গাড়ি চালাচ্ছে অন্য একজন। তার পাশে বসে আছে পৃথা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছেন? পৌঁছে দেব? উঠে আসুন গাড়িতে।

বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ভাল লাগছে পৃথা!

ড্রাইভার ছেলেটির ভাবলেশহীন মুখে আমাকে সহযাত্রী করবার কোনও আপত্তি বা সম্মতি কিছুই দেখলাম না।

আমি কোথাও যাচ্ছি না। তাই আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না।

সত্যি কোথাও যাচ্ছেন না?

না। উত্তর দিলাম হেসে।

পৃথাকে নিয়ে গাড়িটা চলে গেল।

ঘণ্টা খানেক পর ঘরে ফিরলাম। মনে মনে বুঝতে পারলাম এ পৃথাকে কোনওদিন আমি পা.ব না। আশা করাটাই বোকামি। ওকে সজলদের মতো কেউ শেষ পর্যন্ত জয় করে নেবে। কিছুদিন চার-পাঁচজনের সঙ্গে খেলা করবে পৃথা। তারপর ওদেরই মধ্যে কেউ ওকে সরিয়ে নেবে। বিয়ে করবে, গোটা দুয়েক সন্তানের জন্ম দেবে। তারপর পৃথাও অতি সাধারণ হয়ে যাবে। মাত্র কয়েক বছরের যৌবন খেলা, বিয়ে-বিছানা-সংসার ; সব স্মৃতি হয়ে যাবে। তখন শুধু টাকা-পয়সার হিসেব, ছেলেমেয়ের স্কুল এই সব অঙ্ক কষবে পৃথা! তারপর একদিন শুরু হবে বিছানায় ঝগড়া, আলাদা হবে বিছানা। ছোঁয়াছুঁয়ি বন্ধ হবে। এমনি করে একদিন বের হয়ে আসবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস। ফেলে আসা পথের কথা মনে পড়বে। মনে হবে তাই তো, জীবন এত্ত ছোট কেন?

দিনগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে পার করছি। যেমন-তেমন করে এই পার করা। এই পার করার কোনও মানে নেই। সঞ্জয়ের আমন্ত্রণ একটা উপলক্ষ মাত্র, আসলে জায়গাটা আমার ভাল লাগে। তাই ফাঁক পেলেই চলে আসি।

সন্ধ্যারাগের রঙ ফোটার আগেই পৃথা সব জানালা খুলে দিয়েছিল। পাঁচটা বেজে গিয়েছে। জানালা দিয়ে সোনালি রোদের ছটা ঢুকছে। শরৎকাল, পুজো আসছে। এ সময়ে আকাশে-বাতাসে কী এক অপার্থিব মায়া মাখানো থাকে। জানালার বাইরে অনেক উঁচুতে, ঝকঝকে নীল আকাশ। তার এক কোণে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ পাহাড় হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। জানালার গা-ঘেঁষে পুরনো গদিওলা বিছানা, শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম সব। এটাই এ বাড়ির গেস্ট রুম।

সঞ্জয়ের ঘরে একটাই বিছানা। ও-ঘরে দুটো বিছানা পাতার জায়গা নেই। জানালার পাশে একটা টেবিল, তার ওপর কতগুলো বই আছে। আর আছে হাতল ভাঙা একটা চেয়ার।

সঞ্জয় বলে, চল্ নীমপীঠের দিকে ঘুরে আসি।

তাহলে পাজামা-পাঞ্জাবিটা পরে যাই, কী বলিস?

পড়ে নে। পৃথাও আমাদের সঙ্গে চলুক।

পৃথা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মুখ দেখে মনে হল খুশি হয়েছে ও।

বের হবার সময় দেখি—পৃথা একটা নীল রঙের শাড়ি পরেছে।

ওকে রাগাবার জন্য বললাম, এ তুমি কি পরে এলে? একটা ভাল শাড়ি পরো।

পৃথা ঠিক বুঝতে পারল না আমার ঠাট্টা। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে চিকন গলায় বলে, দেখতে খুব খারাপ লাগছে না?

ওকে এবার খুশি করার জন্য বলি, না, না। মোটেও খারাপ লাগছে না।

বাইরের হাওয়া মাঝে মাঝে ভীষণ ভাল লাগে। এই হাওয়ায় শরীরে তা ধিন তা ধিন ছন্দ জেগে ওঠে। অনেকদিন আমরা এ রকম এক সাথে বের হইনি। পৃথা প্রাণ খুলে হাসে। ওকে হাসিতে পায়। ওর সারা শরীরে আনন্দধারা। মনে স্ফূর্তি। ওর সামনে আলোয় ঝলমল একটা জগৎ। এ জগতে ও হাঁটে না, ও যেন পরীর মতো ওড়ে।

কী যে ভাল লাগছে ওকে দেখে! এই হচ্ছে সত্যিকারের পৃথা। ওকে বলতে ইচ্ছে করছিল—সজলদের কাছে ভিতরের তুমি আড়াল হয়ে যাচ্ছ পৃথা। এখন দেখো তুমি কী জীবন্ত! কী অসম্ভব সুন্দর তুমি—প্রজাপতির মতো। তোমার মুখে দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই, গোপন কষ্ট লুকিয়ে রাখার কোনও চিহ্ন নেই। এই তুমি অন্য রকম—তুমি নিজেই দেখ। মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম পৃথাকে।

দুপাশে সবুজ ধানের জমি। চাষীরা মাঠের কাজ শেষে ফিরছে ঘরে। এদের গায়ের রঙ, পোশাক আশাক, কাজের ধরনের সঙ্গে আমাদের বিস্তর ফারাক। এ দেশের মহাপুরুষরা বলে গেছেন—কোনও মানুষ ছোট নয়, কোনও মানুষ বড় নয়, সবাই মানুষ। কেউ ছোট কাজ করে, কেউ বড় কাজ করে। কিন্তু সবাই মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। এই মর্যাদা পাওয়ার এবং দেওয়ার জায়গাটাতেই যত গণ্ডগোল। এ দেশে তাই শ্রেণীবিদ্বেষ রয়েছে, রয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম।

পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ঘরে ফিরছে। ফুরফুরে হাওয়ায় পৃথার চুল উড়ছে।

বেঁচে থাকার জন্য মাঝে মাঝে বেড়ানো দরকার। কী বল? সঞ্জয় বলে।

হ্যাঁ। বেঁচে থাকার জন্য শুধু খাদ্যটাই সব নয়। ক্লান্ত গলায় বললাম আমি।

যখন ঘরে ফেরা হল তখন বেশ রাত। জামা-কাপড় ছেড়ে সোজা বিছানায় চলে গেলাম। পৃথাকে বলে দিলাম রাতে আর কিছু খাব না। বলে দিও।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করি। ঘুম আসে না। কিছু পরে সঞ্জয়ের কাকিমা খাবার জন্য ডাকতে আসেন।

কী হয়েছে? চুপচাপ—

না কিছু না।

কথা বলছ না যে।

কী বলব।

কেন কিছু কি বলার নেই?

সঞ্জয়ের কাকিমা আমার আরও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথা কিছু বলল?

না।

উঁ হুঁ! তোমার মন ভাল নেই বুঝতে পারছি।

আসলে আমার নিজের ওপরই খুব রাগ হচ্ছে।

কেন রাগ হচ্ছে?

এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিই না। নৈঃশব্দের জলে ডুবে থাকি। মনে মনে বলতে

চাই—আমাকে একটু একা থাকতে দিন! দোহাই আপনার! কিন্তু বলতে পারলাম না। শোভনা হয়তো বুঝতে পারলেন। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পৃথার মধ্যে একটা নেশা জেগে উঠেছে। একে কীভাবে ব্যাখ্যা করব? আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। আমার নিজেরই ভবিষ্যত কী তাই আমি জানি না। তবু পৃথাকে আমার জীবনের সাথে জড়াতে চাই। পৃথা একটা দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছে। আর আমি বসে আছি একটা কাঠের ঘোড়ার পিঠের ওপর। আমার সাথে পৃথার তুলনা হয় না। পৃথা আমাকে বড় স্বপ্ন দেখাতে চাইছে। আমি যে মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে এই বড় স্বপ্ন দেখা আকাশ কুসুমই শুধু নয় অলীকও বটে।

আমার তাই বড় ভয় করে। পৃথা যেন পাখা গজিয়ে ওঠা পিঁপড়ের মতো দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে আগুনের দিকে—পৃথা সাবধান! শোনো, এ অসম্ভব, এ হয় না। তুমি আগুনে হাত দিতে চাইছো। এর তাপ একটা সময় পর্যন্ত ভাল লাগে। তারপর এটা অসহ্য লাগবে। তারপর শরীর ঝলসে দেবে। তুমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এ পৃথিবীতে তোমার আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

মানুষ কার জন্য কষ্ট পায়। যাকে ভালবাসে? যাকে করুণা করে? পৃথা ভালবাসার মর্ম কিছু বোঝেই না। তার শরীরে রূপ কিছু বেশি, যৌবন প্রজ্বলন্ত, তাই নিয়েই সে মশগুল। অন্তত এখন সজল তার দিকেই খুব মনোযোগী। আমি কেউ না। সজলের মতো ছেলেরাই পৃথার সমকক্ষ বন্ধু হতে পারে।

আমার বিশ্বাস হয় না যে এরকম একটা জীবনের সঙ্গে আমি জড়িয়ে গিয়েছি। যেন স্বপ্নের ভেতর এক এক করে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। স্বপ্ন ভাঙতেই দেখতে পাই যাদবপুরে হস্টেলের ঘরে শুয়ে আছি নিজের বিছানায়। ছাদের ওপর জলের ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে গেছে। ওভারফ্লো পাইপটা দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে। একটা বেনে বউ উড়ে উড়ে সেই জল খাচ্ছে। সিনেমার মতো একটা ছবি। এই ছবিটা প্রায়ই আমি দেখি। আমার ভাল লাগে। যেদিন যেদিন দেখি—দিনটা আমার ভাল যায়। আমি আবার জয়নগরে চলে আসি।

একটা বেড়ালের গল্প—বেশ কিছুদিন আগে এই গল্পটা লিখেছিলাম। সঞ্জয়কে পড়িয়েছিলাম, ওর ভাল লেগেছিল। বলেছিল বাস্তবের মধ্যে অবাস্তব-এর যে সংমিশ্রণ তাই আমাকে টানে। যা কারও লেখায়, কারও ছবিতে হঠাৎ হঠাৎ কখনও পাওয়া যায়। এ গল্পের নায়িকা যখন শেষে জানালা খোলে—দেখতে পায় বিশাল সমুদ্র। ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক পাখি আলবেট্রেস।

আলস্য প্রিয় মানুষ আমি। কি করে যে লিখেছিলাম গল্পটা, আমি নিজেই জানি না। পা নাচাচ্ছি, পা নাচাচ্ছি। লিখছিও না, পড়ছিও না। এই পা নাচানো, আসলে নিজের সঙ্গে থাকা। লেখার চেষ্টা করা। আসলে লিখতে আমি পারি না। অনেক ইমেজকে টেনে নিয়ে আসা অনেক বড় কাজ। ভাবি বটে, পেরে উঠি না। অনেক ইমেজ যা আমার ব্যক্তিগত যাদের বের করে আনতে চাই, আমার মাথার হার্ড ডিস্কের ভেতর থেকে ; যেন ঝুলি থেকে বেড়াল বের হচ্ছে এ রকম আমি পারি না। বড় বড় লেখকরা এসব পারেন।

তা সেই বেড়ালের গল্প! খুব ছোটবেলার ঘটনা। বাড়িতে তখন ফ্রিজ ছিল না। সন্ধ্যার পর মা সাধারণত কোনও কাজ করতে চাইতেন না। কারণ তাঁর একটা পুরনো হারমোনিয়াম ছিল, সেটা বাজিয়ে গান করতেন। আমাকে বলতেন, চোখ বন্ধ করে গান শুনবি। সেই থেকে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে চোখ বুজে গান শোনার। মা বলতেন, সুর থেকে ইমেজ বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে আসে ছবি। চোখ বুজেই দেখা যায় সেই ছবি।

মা'র গান করার সময় প্রায়ই সেই বেড়াল মাছ খেয়ে পালাত। ফলে গান শেষ করে মাকে আবার রান্না করতে হতো। মা খুব বিরক্ত হতেন। একদিন সেই বিড়াল ধরে দাদার সাথে গিয়ে জঙ্গলে রেখে এলাম। পাঁচ'ছ দিন পর রান্নাঘরে হঠাৎ আওয়াজ হল। ছুটে গিয়ে দেখি গোঁফ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই বিড়াল। জানালা দিয়ে বেড়ালটা বেরিয়ে গেল। তেরে ওকে মারতে গেলাম। দেখি বিশাল এক সবুজ সমুদ্র। তার মধ্যে ওর ল্যাজটা সোজা উঁচু একটা অ্যানটেনার মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

এখনও সেই বিড়ালটার সঙ্গে মনে মনে কথা বলি। যখন নিদ্রাহীন রাত পার করি অথবা দিনের বেলা বসে বসে যখন ঝিমোই। কখনও কখনও অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি বিড়ালটা জঙ্গলে হাঁটছে ল্যাজ উঁচিয়ে, কখনও আমার দিকে দৌড়ে আসছে। আমিও দৌড়চ্ছি, দৌড়চ্ছি, হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি বিড়াল নয় একটা বাঘ।

ওরে বাপ! ছুটতে গিয়ে পড়ে গেলাম। বাঘটা ধীরে ধীরে কাছে এল। অথচ কিছু বলল না। কেবল বাঘ, আর আমি। তারপর ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করলাম সারা গা ঘামে ভিজে গেছে! বুকের ভেতর ধুকপুক আওয়াজ হচ্ছে। উঠে জল খাই, বাথরুম করি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সব ভুলে যাই। জানালায় দাঁড়াতেই দেখি পৃথা দাঁত মাজছে। ওর দাঁত মাজার ধরন দেখে মনে হয় না যে এই শরীরসর্বস্ব ভালবাসায় আমিও কাঙাল হয়েছিলাম। না জানি এই শরীর কত পুরুষের বন্দনা পেয়েছে! শরীরী এই ভাললাগা আর আমাকে মোটেও উত্তেজিত করে না। ইচ্ছে করলেই তো ওর শরীরে তৃষ্ণার্ত আঙুল, ঠোঁট বুলিয়ে নিতে পারি। শরীরের কোথায় কোন ঠোঁট, সেই ঠোঁটের পাশে আর এক ঠোঁটের উপস্থিতি সোনার কাঠির সাথে রুপোর কাঠির ছোঁয়া লাগায়। আর তখন ভালবাসার বরফ গলে যায়। সেই বরফ গলা জলে রাজকুমারী সাঁতার দেয়। অথচ ওর সাথে আমার সে সব কিছুই হয় না।

তুখোড় সাঁতারু পৃথা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দাঁত মাজে। চাপা কলে মুখ ধোয়। মাথাটা ডান দিকে হেলিয়ে চেঁচিয়ে বলে, উঠে পড়ুন, চা আনছি!

চা দিতে এসে পৃথা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

সকালের আলোয় হাঁটব। দেখব চারপাশটা। যাবে না কি?

কোনও উত্তর দিল না পৃথা। চায়ের কাপ নামিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

চা খেয়ে বাইরে এলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল রাস্তার ধারে এক বোঝা আবর্জনা। আবর্জনা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে দুটো নেড়ি কুকুর। কালীমন্দিরের পাশে ছোট্ট মাঠটায় ক'টা ছেলে খাঁকি হাফ প্যান্ট আর সাদা হাত কাটা গেঞ্জি পরে লাঠি খেলছে। লাঠি খেলা আমার ভাল লাগে। আমাদের দেশি খেলা, অথচ হারিয়ে যাচ্ছে বললেই হয়।

এরা নাকি হিন্দুত্ববাদীদের দল। এরা দেশ থেকে অহিন্দুদের তাড়াতে চায়। হিন্দু গৌরব, হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা করতে এরা রাজনীতিতে নেমেছে। হিন্দু ছাড়া অন্য কোনও জাতি এদেশে থাকুক এরা তা চায় না। থাকতে গেলে তাদের মাথা নিচু করে থাকতে হবে। ওদের ভয় হিন্দুদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না, সবাই পরিবার পরিকল্পনার নিয়ম মেনে চলে। ছোট পরিবার সুখী পরিবার—এই নিয়মে হিন্দু মেয়েরা বেশি সন্তান জন্ম না দেবার লাইসেন্স পেয়ে গেছে। অথচ অন্যরা বছর বছর সন্তান উৎপাদন করে যাচ্ছে। ফলে হিন্দুদের দেশ, হিন্দু সংস্কৃতি বলে ভবিষ্যতে কিছু থাকবে না, তাই অন্যদের তাড়িয়ে দেশটির পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। হিন্দু জনসংখ্যা বাড়াতে হবে। উঁচু জাতের মানুষ তৈরি করতে হবে।

লাঠি খেলা দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু এই আবেগকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি না। যেভাবে ইংরেজদের তাড়াতে হয়েছে দেশের স্বার্থে, এ তাড়ানো তো সেরকম নয়। ঔপনিবেশিক শক্তিকে এদেশে আসন পেতে দেবার জমি তৈরি করে দিয়েছিল জগৎশেঠ উমিচাঁদের দল। তারা হিন্দু ছিল। মীরজাফর ছিল মুসলমান। আবার দেশটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল মীরমদন আর মোহনলাল। একজন মুসলমান, একজন হিন্দু। এই দেশটার ইতিহাসে, সুখে দুঃখে, শৌর্যে বীর্যে হিন্দু মুসলমান একীভূত হয়ে আছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিয়ে নানা ভাষা, নানা জাতি বিরাট মহীরুহের শাখা-প্রশাখা হয়ে বিকশিত হয়েছে। আজ হঠাৎ যদি তার ডালপালাগুলো কাটতে শুরু করা হয়—গাছটা বাঁচবে তো?

এ দেশের মানুষ এখনও মানুষ হয়ে ওঠেনি। তারা জনতা জনার্দন। জনতা হল 'শক্তি', এ 'শক্তি'কে যে যেমন পারছে কাজে লাগাচ্ছে। কংগ্রেস একশ বছরের একটা পার্টি। সামনের একশো বছরে ক্ষমতায় আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। অন্য পেটি বুর্জোয়া পার্টিগুলো জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে করে কম্মে খাবে আর বামপন্থীরা বারবার ভুল করে শিক্ষা নিয়ে নাবালক থেকে যাবে।

মন উদাস করা চিন্তাভাবনায় এলোমেলো হেঁটে বেড়াই। সকালের রোদ পড়েছে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ডাউন প্ল্যাটফর্ম এখন খালি। চায়ের দোকানে বেশি ভিড় নেই। এখানে এক কাপ চা খাব।

লাইন পার হতে গিয়ে দেখি—সঞ্জয়ের কাকিমা হেঁটে আসছেন।

আপনি?

আমিও মর্নিংওয়াক করতে বের হয়েছি। হেসে উত্তর দেন শোভনা।

কিন্তু তোমার তো একা আসার কথা ছিল না।

ছিল না তো:

তবে একা কেন?

আপনিও তো একা।

ও মা! আমি আবার একা কোথায়? শোভনা চোখ নামিয়ে বলেন।

এখন তো একাই।

আসলে আজ রেল লাইনের ধার দিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করল। আজ আমার সঙ্গী নেই। তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিলাম।

তাই বুঝি। চা খাবেন?

না।

একটু দাঁড়ান, শাড়িটা আটকে গিয়েছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা বুনো গাছের শুকনো ডালে শোভনার শাড়ি আটকে গিয়েছে।

নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়িটা খুলে দিলাম। নজরে পড়ল ওঁর সুগোল টুকটুকে ফরসা পায়ের গোছ। আর সেই পায়ের পাতার চারপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে আলতার রেখা।

শোভনা একটু লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। ওঁর পায়ের কাছে আমার হাত চলে যাওয়ায়। মাথায় ঘোমটা টেনে হাঁটতে শুরু করলেন। যত দ্রুত সম্ভব সরে গেলেন। বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন।

শোভনা। সঞ্জয়ের কাকিমা... শোভনা নামটা খুব চেনা চেনা লাগে। আমাদের গ্রামে এই নামে একটা মেয়ে ছিল। তার বিয়ের সময় কী একটা গোলমাল হয়েছিল। এই শোভনার বাপের বাড়িও তো কাঁদি! তাই তো! ভেবে দেখিনি। স্টেশনের চা-স্টলে ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধমাখা চা খাই। সামনে একটা সুপুরি নারকেলের বড় বাগান। আকাশের দিকে মাথা তুলে সারি সারি গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় কী যেন প্রার্থনা করে সব সময়। একটা শিমুল, দুটো বট দাঁড়িয়ে আছে জলার ধারে।

মনে পড়ে—

শোভনা হ্যাঁ শোভনা। বর এসেছে ঘটা করে গ্রামে মোটর গাড়ি চেপে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে বর দেখবার জন্যে। বর এল। হাতে টোপর নিয়ে গাড়ি থেকে বর নামল।

শোভনার জ্যাঠা প্রিয়রঞ্জন খাতির করে বরকে নামিয়ে নিতে গেলেন।

বরের বাবা বললেন, গাড়ির ভাড়াটা মিটিয়ে দিন।

হন্তদন্ত হয়ে প্রিয়রঞ্জন বললেন, কত?

হাজার টাকা।

হাজার টাকা শুনে চমকে গিয়েছেন প্রিয়রঞ্জন। এই জামাই এর জন্যে গুনে চল্লিশ হাজার টাকা আগাম দিতে হয়েছে। আবার দশ ভরি সোনা আছে। অথচ তার ওপর...

বললেন, গাড়ি ভাড়াটা পরে দিলে হবে না বেয়াই মশাই?

বরের দাদা বললে, পরে আর কখন দেবেন। আমরা তো রাতেই ফিরে যাবো।

সেই হাজার টাকাই শুধু নয়, আরও পাঁচশো টাকা-সহ দানের সামগ্রী বিছানা আলমারি সমস্ত কিছু তুলে দিতে হল ওদের গাড়িতে।

কিন্তু শুভদৃষ্টির আগেই শোভনা বিয়ের পিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল। অসুস্থ শোভনাকে নিয়ে যখন সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লগ্ন বয়ে গেল—বরকে নিয়ে পালিয়ে গেল বরের বাবা।

বলে গেল, একটা এঁটো মালকে নাকি গছাতে চেয়েছিল শোভনার জ্যাঠামশাই। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে গেছে।

বিয়েবাড়িতে নেমে এল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। শোভনার জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন বর চলে গেছে। লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে নিয়ে তখন সবাই কান্নাকাটি করছে।

শোভনার বাবা চিৎকার করে কাঁদছেন, তোর মরণ হল না রে!

সেদিন প্রায় সকলেরই এই বিলাপ শোনার পর শোভনা পাথরের মতো চুপ করে বসেছিল।

এগিয়ে এল বরযাত্রীদের মধ্যে একজন। বয়স তার একটু বেশি এই যা! জীবনে বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না, না বিয়ে করার সময় হয়ে ওঠেনি—এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অপেক্ষা করার সময় হাতে ছিল না কারও। জাত বিচারও বোধহয় খেয়াল ছিল না কারও। অবশ্য সঞ্জয়ের কাকা উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ সবার জানা ছিল।

যাই হোক, লগ্নভ্রষ্টা শোভনাকে পার করার কথাটাই তখন সবাই ভাবছে অন্য কিছু নয়। তাইই হল শেষ পর্যন্ত। শোভনাকে নিয়ে গিয়ে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসালো সবাই ধরে ধরে। নতুন বরের সঙ্গে তার মালা বদল হল। শোভনা তখন একটা পুতুল হয়ে গেছে। চোখ খোলা তবু দেখতে পাচ্ছে না। কান খোলা কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মুখ আছে কিন্তু কথা বলতে পারছে না।

বড়রা সবাই মনে প্রাণে বলছে—হে ঈশ্বর, মেয়েটা যেন সুখী হয়।

দেশের বাড়িতে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি ছিলাম সেই বিয়ে বাড়িতে একজন নিমন্ত্রিত মাত্র। আমাদের বাড়ির সবারই নিমন্ত্রণ ছিল ওদের বাড়ি। কিন্তু সেদিন গ্রামে বেশ কয়েকটা বিয়ে ছিল। আমাদেরই তিনটে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। তাই সকলে ভাগাভাগি করে গিয়েছিলাম এ বাড়ি ও বাড়ি।

বিয়ে বাড়িতে গিয়ে এসব ঘটনা দেখে খেতে বসার আর প্রবৃত্তি হয়নি। ঘটনাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ এতদিন পরে সেই ঘটনার পাত্র-পাত্রীদের চোখের সামনে উপস্থিত হতে দেখে অবাকও হই আবার মনে আনন্দ জাগে।

শোভনা গ্রামের মেয়ে ছিল। ফ্রক পরা অবস্থায় দু'চারবার ওকে দেখেছিলাম। বিয়ের দিন ওকে দেখার আগ্রহ ছিল, সুযোগ হয়নি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়ির মেয়েরা ওকে ঘিরে রেখেছিল। ডাক্তারও ডেকে আনা হয়েছিল।

সেই শোভনা আজ হাজির এ বাড়ির বউ হয়ে। কতদিন পর! প্রায় সাত-আট বছর। এই সাত-আট বছরে আমার কী কী পরিবর্তন হয়েছে ভাবি। তখন গ্রামের স্কুলে পড়তাম। স্কুল ফাইনাল দিয়েছি গ্রাম থেকে, উচ্চ-মাধ্যমিক পড়তে গেলাম বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে।

ওখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হলাম। তারপর যাদবপুরে পড়তে আসা। কাঁদি, বহরমপুর, যাদবপুর হয়ে জয়নগর আসা। এর মধ্যে কত জল বয়ে গিয়েছে গঙ্গা দিয়ে।

এই সেই শোভনা! ও তবে বুঝি আমাকে চিনতে পেরেছে। আগ বাড়িয়ে পরিচয়টা দিতে চাইছে না। বাড়ি ঢোকার মুখে শোভনার সঙ্গে দেখা হল আবার। আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি উপহার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, প্রাতঃভ্রমণ সারা হল?

কথা বলার ভঙ্গি আমাকে অবাক করল।

উত্তর দিলাম, হল।

ওকে দেখে একবারও মনে হল না যে বোঝাল একটু আগে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ও নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না, আমিও না। যেন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক অথবা আদৌ ঘটেনি। কিছুই ঘটেনি এমন স্বরে আমরা কথা বললাম।

চা খাবে?

খাব।

তাহলে বসার ঘরে গিয়ে বস। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

চমৎকার একটা হাসি দেখলাম এখন ওর মুখে। সঞ্জয় এখন কোথায় জানি না। কাছে পিঠে পৃথাও নেই। শোভনা এল, ওর হাতে চা। ভাল লাগার না-লাগার দোলাচলে আমার হাতের তালু ঘামতে থাকে। নাকের পাটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়। শোভনা জিজ্ঞাসা করে, বিস্কুট খাবে?

না। ঠিক আছে।

শোভনার মুখমণ্ডল এখন রক্তাভ। চাপা স্বরে ওকে জিজ্ঞেস করি আপনি চা খাবেন না?

আমি এখন চা খাই না।

দেখি খিদে সামাল দিতে গুড় দিয়ে দুটো রুটি খেল শোভনা। স্নান করে পুজো সেরে নিয়েছে। স্নানের জলে ধুয়ে গেছে সিঁথির সিঁদুর। তাই নতুন করে আবার পরেছে। ধুয়ে গেছে চোখের কালি। ওকে শুদ্ধ স্নিগ্ধ লাগে।

আপনাদের অনেকদিন বিয়ে হয়েছে না?

হ্যাঁ। ছ' বছর।

মাত্র ছ'বছর? আমি তো ভাবলাম সাত/আট বছর!

না। ছয়ের কিছু বেশি হবে।

ছেলেপুলে?

না।

গোলাপি শাড়ি, কপালে লাল টিপ, এই বাঙালি বধূসাজ এই সুন্দরতা বোধহয় জগৎ বিখ্যাত। ঘরের মধ্যে দুটি মাত্র চেয়ার। তার মধ্যে একটিতে বইপত্র ডাঁই করা। আমি বিছানায় বসে ওকে চেয়ারে বসতে বললাম। ওর মুখে সোনালী রোদ পড়েছে। কপালের টিপটাকে দেখাচ্ছে রক্তের ফোঁটা যেন। পিঠের ওপর চুল এলো করা। হঠাৎ ওকে জিজ্ঞাসা করি, এই ঘর-সংসার ভাল লাগে?

শোভনা উত্তর দেয়—না।

জিজ্ঞেস করি আবার, না কেন?

স্বামীর সঙ্গে আমার মেলে না।

কেন মেলে না?

মেলে না কারণ দুজন আমরা ভিন্ন ধরনের মানুষ।

আপনাদের তো সামাজিক বিয়ে হয়েছিল। মানে লভম্যারেজ নয়।

হ্যাঁ।

তবে?

কী তবে?

বিয়ের পর আপনাদের ভালবাসা হয়নি?

একটা বিষণ্ণ মুখ, ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে চায়।

শোভনা বলে, এসব কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে না। আমাকে একাই থাকতে দাও।

শোভনা চলে গেল। আমার মনে হল ও ওর ইচ্ছের গলায় শেকল পরিয়ে সরে গেল। এটাও বাংলাদেশের মেয়েদের একটা বড় গুণ। এদের বুক ফেটে যাবে, তবু মুখ ফুটে এরা কিছু বলবে না। সেই শরৎবাবুর যুগ থেকে এরা এখনও একই রকম রয়ে গেছে।

ইদানীং পৃথা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠছিলাম। এরই মধ্যে একদিন ও এসে বলল, এক্ষুণি বের হতে হবে, রেডি হয়ে নিন।

কোথায় যাবে বলবে তো?

ডায়মন্ডহারবার!

ডায়মন্ডহারবার। সে কী এখন? হুট করে এভাবে যাওয়া যায়?

বেশি প্রশ্ন করবেন না তো। যা বলছি তাই করুন।

স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। পৃথার প্রতি ক্ষুব্ধ বা রুষ্ট হতে পারিনি। ওর কী দোষ! ও তো নিমিত্ত মাত্র, এটা আসলে তো একটা জমাটি খেলা। মনে হয় সজল বা পৃথার অন্য কোনও প্রেমিকের ওপর শোধ নেওয়া হবে, যদি এই সুযোগে আমি পৃথাকে হঠাৎ ধরে ফেলে কিছু করে বসি।

ধরা যাক্ সেসব কিছু না করেও ঘরের মধ্যে শান্ত চোখে পৃথাকে আস্তে আস্তে বললাম, পৃথা, তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। তুমি আমার হও।

কিন্তু আমি জানি—এরকম কিছু করে পৃথাকে চোখের জলে ভাসানো যাবে না বা গলানো যাবে না। আর পৃথাও জানে এসব তার জলভাতের মতো। নির্জনে ওর বুক ছোঁয়ার ভীরু প্রয়াসকে ও অবহেলায় সরিয়ে দিতে পারে। তেমনি অবহেলায় শয্যা থেকে নিঃশব্দে উঠে চুল বা গায়ের জামা ঠিকঠাক করে ফেলবে। এমন কী হয়তো এক গেলাস জল খেয়ে বলবে, বাব্বাঃ আপনিও!

ভেতরে ভেতরে একটা পোকা কুটকুট করে কামড়ায়। আমার চোখের সামনে শুধু একটা নীল বাতি জ্বলে। এই নীল বাতি ঘেরা ইন্দ্রজাল আমার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়।

পৃথা আসে প্রজাপতি হয়ে। ডোরাকাটা হলুদ শাড়ি, নক্ষত্রের ছোপে ভরা ফিকে ব্লাউস, উঁচু ব্রেসিয়ারের জটিল নকশাটা স্বচ্ছ জলের নিচে সাদা শঙ্খের আভাস দিচ্ছে। মনের ভেতরের যত কুমতলবগুলো নাড়িয়ে দেয়।

বললাম, চলো যাই।

আমরা যেন কপোত কপোতি। সেজেগুজে বের হয়েছি। প্রথম প্রেমের পর বিয়ে, মধুচন্দ্রিমায় বের হয়েছি। শরীরে রোমাঞ্চ। ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে চলেছি রাজকন্যাকে।

বারুইপুর থেকে ডায়মন্ডহারবার লোকাল ধরেছি। ট্রেনের ভেতরটা লোকজনে ঠাসা। তবু উঠতে হবে যে করে হোক। প্রথমে দুজনে ছিটকে গেলাম। তারপর ঠেলেঠুলে উঠে দাঁড়াবার মতো জায়গা পেলাম দুজনে। সিট একটাও খালি নেই। সবাই পুরুষ। অনেকগুলো পুরুষ শরীরের চাপে পৃথা ট্রেনের মধ্যে ঘামতে লাগল। ট্রেনটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা আহত পশু। গর্জন করতে করতে গোঁয়ারের মতো সামনে ছুটছে। একবার আমার মনে হল, আমারই বুকের ভেতর থেকে চাপা ভঙ্গিতে

অমন ধরনের একটা শব্দ বের হয়ে আসছে। পৃথার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাইছি—পারছি না।

ট্রেনটা এত লেট করল যে ডায়মন্ডহারবার পৌঁছতেই সন্ধে হয়ে গেল। গঙ্গা বলব না একে সাগর। আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি তখন নিভন্ত সূর্যের রক্তবর্ণ আলোয় কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে নীরস পাথুরে বাঁধের ওপর। এতদূর এসে খালি খালি ফেরার কোনও মানে হয় না। সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে চলতে চলতে পৃথা জানতে চাইল, কোনও হোটেল পাওয়া যাবে না রাতটা কাটানোর জন্য?

তার মানে? আজ ফিরবে না?

না।

বাড়িতে ভাববে না?

পৃথা মুখ টিপে হাসল—বলে এসেছি। ফেরার পথে কাঁটাবেড়িয়ায় মাসির বাড়ি রাত কাটাব।

তুমি তাহলে ভেবেচিন্তেই এসেছ?

কেন? আপনার কি খারাপ লাগছে? বেশ তো একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে।

আমি চুপ করেছিলাম। ভাবছিলাম পৃথাকে বলি, তোমার এরকম খেলতে খুব ভাল লাগে না পৃথা? কিন্তু হঠাৎ চারদিক তোলপাড় করে দারুণ হাওয়া এসে গেল ঝাঁপিয়ে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা চড়বড় করে পড়তে শুরু করে দিল মাথায় পিঠে কাঁধে। বাঁ পাশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ডান পাশে গঙ্গাতীর বরাবর সমান্তরাল পিচের রাস্তা। অন্ধকারে মস্ত গাছের শাখায় হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ দোল খায়। ল্যাম্প পোস্টের বাতিগুলো দুলতে দুলতে জ্বলে। তির তির হাওয়ায় ওরা কাঁপছে অবোধ শিশুর মতো। বৃষ্টির ফোঁটা ধারায় ধারায় চুইয়ে পড়ছিল পৃথার মসৃণ গাল বেয়ে। ড্যাবডেবে চোখে তাকাচ্ছিল গাছতলায় দাঁড়ানো লোকগুলো। ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো বারবার ঝাপসা হতে হতে নিভে গেল দপ করে। কারেন্ট ফেল!

এখন অন্ধকার। সামনে গঙ্গার প্রলয় জলরাশিতে ঝড়ের পাখা বাজছিল। ব্যস্ততা হুটোপুটি হাঁকডাক, দূরে স্রোতের জলে আলোকবিন্দু কম্পমান। মহাজনী নৌকোর পাল নেমেছে পাটাতনে। আমাদের চারপাশে দোমড়ানো মোচড়ানো অজস্র শরীর। গুটিয়ে অচ্ছুত কুকুরগুলোও অসহায়ভাবে ভিজছিল। বারবার ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল ক'জন ছেলে। কুকুরগুলোও সরে গিয়ে আবার ফিরে আসছিল বারবার। রিকশোওলারা আর ভিখিরিরা কেউ কেউ গলা ছেড়ে গান গাইছিল। একটা পোড়ো বাড়ির মতো মনে হচ্ছিল চারপাশটাকে।

এক সময় পৃথা ফিসফিস করে বলল, চলুন অন্য কোথাও যাই। এখানে লোকগুলোকে ভাল লাগছে না। লোকগুলোর পক্ষে ভাল থাকা সম্ভব ছিল না বোধহয়। ওরা দেখেছিল এখানে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মনে হল, এদের জানিয়ে দেওয়া উচিত, আমরা নেহাত হালকা নই। গলাটা ঝেড়ে কথাটা ওদের দিকে ছুড়ে দিলাম—ভাই কারও কাছে দেশলাই আছে?

সিগারেট আমি খাই না। সিগারেট ধরাবার জন্যও আমি দেশলাই চাইনি। ঘড়িতে

সময় দেখবার অছিলায় কথাটা বলা। একজন দেশলাই জ্বালাল। ঘড়িটা দেখলাম—রাত আটটা। তারপর ফের অন্ধকার হল। কাজ হল কিছুটা। গান থেমে গেল। একটা গুমোট নিস্তব্ধতা, অস্ফুট আক্ষেপ আলতো গালমন্দ কিছুক্ষণ অন্ধকারের গা বেয়ে ঘুরঘুর করে বেড়িয়ে শেষে পিছলে আবার সেই গুমোট ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা নেমে এল অতি সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে। একরকম ত্রাস লাগে। পৃথা ভয় পায়। গোপনে ও আমার হাত স্পর্শ করে। যেন বলতে চায়—এমন হয়ে গেল কেন সব?

শেষে পৃথা সন্দেহসঙ্কুল কণ্ঠে চুপিচুপি বলে, আমার ভয় করছে, এখান থেকে চলুন।

আমাদের চারপাশে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছিল। আমারও গা ছমছম করে উঠল। মনে হল পৃথার বিপদ আসছে। যেন কেউ বা কারা এই বৃষ্টি অন্ধকারে ওকে তুলে নিয়ে গঙ্গার দিবে চলে যাবে।

ওকে বললাম, চলো যাই।

বৃষ্টির মধ্যে আন্দাজ করে ছুটলাম দুজনে। পৃথা আমার হাত ধরলো। যেতে যেতে বললাম, এখানে একটা পরিচিত হোটেল আছে রাতটা সেখানে থাকবে?

ইচ্ছে হলে চলুন।

কেন তোমার ইচ্ছে করবে না?

পৃথা আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কতদূর আর?

হোটেলে গেলে যা যা ঘটবে ভাবতে থাকি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাই। বলি, আমরা নিতান্ত রাত কাটানোর জায়গা চাইছি। সব সময় একটু সতর্ক থাকবে।

হোটেলটায় অনেকদিন আগে একবার এসেছিলাম। পাঁচবন্ধু মিলে একটা রাত কাটিয়ে গিয়েছিলাম। তাই ঘরগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া ছিল। ফ্রন্ট অফিসে বসা রিসেপশনিস্টকে বললাম, আজকের রাতটা থাকার মতো একটা ঘর চাই।

ওকে। বলে রিসেপশনিস্ট খাতাটা সই করার জন্য এগিয়ে দিল। পৃথার সিঁথিতে সিঁদুর নেই তাই পরিচয় লিখলাম মুসলমান দম্পতি হিসাবে।

ফ্রন্ট অফিসের ছেলেটি এমন মুখ করল মনে হল যেন বলছে-থামুন থামুন। এ লাইনে কত দেখলাম।

হোটেলের লোকের সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় উঠে এলাম। ওর হাতে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। ঘরের টেবিলে ওটা দাঁড় করিয়ে রাখলো লোকটা। কটু গন্ধে চারদিক ভরা। বললাম, জানালা দুটো খুলে দাও।

এক জগ জল ভরে দিয়ে লোকটা চলে গেল। মোমবাতির কাঁপা আলোয় আমার ছায়াটা দেওয়ালে পড়েছে—একটা বিকটরকম চেহারা।

হোটেলের লোকটা জিজ্ঞেস করল। সাব।

কী ব্যাপার?

ছোট বড় কিছু আনতে হবে?

তার মানে?

দেশি বা বিলেতি? দুটো দশ বেশি লাগবে।

না না। ওসব কিছু লাগবে না।

লোকটার পানরঙা দাঁতে ছিরকুটে হাসি। যেন বলছে, তবে ফুর্তি জমবে কিসে সাহেব? বৃষ্টি বাদলার রাত কাটাবেন কী করে?

শোনো। ওর হাতে একটা একশ টাকার নোট গুঁজে দিলাম। বললাম, খাবারটা গরম আর তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। আমার একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যেস।

জী-সাব। সেলাম করে লোকটা চলে গেল। বাইরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। আলো জ্বলেনি তখনও। ঘরে ঢুকে দেখলাম, পৃথা খাটে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। কাছে যেতেই বলল, এ কোথায় নিয়ে এলেন?

বলেছিল, কিন্তু ওঠেনি, তাকায়নি। ক্লান্ত পৃথাকে দেখে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এবারে কী চাও? জবাব পাচ্ছিলাম না। ওকে শুধু বললাম, তুমি এখানেই শোও। একটা রাত, আমি নিচে গড়িয়ে নেব।

পৃথা একইভাবে শুয়ে থেকে বলল, তা কেন, আপনিও এখানে শোবেন।

তাই হয় নাকি?

পৃথা চোখ খুলে হেসে উঠেছিল। ওর শুয়ে থাকা আগোছাল শরীরে, বাহুতে, গ্রীবায়, জানুতে, ঠোঁটের ওপর ভাঁজে ভাঁজে মোমের আলোর স্তর পড়েছে। ওর বুকের ধীর শান্ত ওঠাপড়া আমার ভেতরে গনগনে আগুন জ্বালছিল। হোটেলের অন্য ঘরগুলোর বন্ধ দরজার ভেতর মারাত্মক উৎসবের ইঙ্গিত চলছিল। বৃষ্টি তখনও থামেনি। কেবলই মনে হচ্ছিল এরকম একটা দিন আমি অনেকবারই চেয়েছিলাম মনে মনে।

পৃথা আমাকে ডাকছিল। কী হল?

ওর চোখে ভীষণ ভয়ঙ্কর আলোছায়ার খেলা চলছিল। ও ঘরের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। কোনও কিছু না বলে নিজেকে দেখছিল। ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আয়নায় আমার চোখে চোখ রাখল পৃথা কাপড়ের আঁচল মুখে চেপে ধরে। পিছন থেকে ওকে আলতোভাবে আকর্ষণ করি। ও ঘুরে দাঁড়ায়। মুখে আঁচল চাপা, ভেতরের কান্না চাপতে পারল না পৃথা। কান্নার অবরোধ ঠেলে হৃদয় শরীরকে কাঁপিয়ে দিল। পৃথার চোখে জল এসে পড়ল। ধরা গলায় পৃথা বলল, সব ভুল হয়ে গেল। বলেই ছিটকে বিছানায় চলে গেল পৃথা। দুহাতে চোখ ঢেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বসে পড়ল। বলল, এবার আমি সত্যি খারাপ হয়ে যাব তপনদা।

মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টানতে টানতে ওকে দাঁড় করাই। বলি, আমি তোমায় ভালবাসি পৃথা। তুমি এমন বলছ কেন?

পৃথা মাথা নাড়ে। বলে, সজলও বলে এমন কথা। যা করতে চাইছেন, আমার মতো মেয়েরা কি এর বেশি ভালবাসা পাবার যোগ্য?

ও কথা বোলো না পৃথা। আমি এখন যেখানে পৌঁছে গেছি, সেখান থেকে ফিরিয়ে দিও না।

পৃথা কিন্তু কথা বন্ধ করে না। বলে, একটু পরেই তো সেখানে ফিরে আসবেন। পাঁচ-সাত মিনিটের তো মামলা, আর সেটাই তো আসল।

আমি তোমাকে যত্নে রাখবো পৃথা।

পৃথা হেসে ফেলে। সজলের মতন পারবেন? ও আমাকে স্বর্গ দেবে বলেছে। বিদ্যুৎগতিতে একটি শীতল ঢেউ খেলে যায় আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

পৃথা বলে, গত রবিবার সজল একটা সি ডি প্লেয়ার দিয়েছে। তার সাথে দশটা ছবির সি ডি। দুর্দান্ত সব ছবি আছে তাতে। আচ্ছা বেশ, আমি এখন ওদের মতন করে শুই। আজই প্র্যাকটিশটা করে রাখি। আপনি আমার প্রথম খদ্দের।

কী বলছ পৃথা! কেঁদে ফেলি।

পৃথা বলে, সব খারাপ মেয়েরাই জীবনের প্রথম খদ্দেরকে কখনও ভুলতে পারে না। এঃ আপনি তো আবার সিগারেট খান না। একটা প্যাকেট নিয়ে এলে ভাল হতো। যাক গে, আসুন এখানেই হয়ে যাক্ আমার ফুলশয্যা।

পৃথা বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজে।

গলায় স্বর ফুটতে চায় না। খাটের ওপর বসে পড়ি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। ওকে জিজ্ঞেস করি, সজলের সঙ্গে এরকম কোথাও গিয়েছিলে?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

তাহলে?

কী তাহলে?

আমাকে এভাবে নিয়ে এলে কেন?

আমি নিয়ে এলাম?

পৃথার চোখে জল টলটল করে। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। ও কাঁদছে, ওকে চিনতে পারি না।

পৃথা বলে, দয়া আর প্রেম পাশাপাশি থাকে এ সংসারে। ভাবি, সজলের সাথে চলে যাব। ও আমার চাকরি করে দেবে বলেছে। ওর সাথে ভালবাসার ঘর করব, নইলে চাকরি করব। পা দুখানা কাঁপে, ছটফট করে। জানি না যা করতে চাইছি ঠিক করছি কি না। কেবল আপনি আমাকে কষ্ট দেন, আজ আপনি আমাকে মুক্তি দিন। আমি নষ্ট হয়ে গেছি, আপনি আমাকে একেবারে নষ্ট করে দিন।

অসহ্য লাগে ওর এসব কথা। খাট ছেড়ে নেমে যাই। ব্যালকনির চেয়ারে গিয়ে বসি।

পৃথা কিছুক্ষণ বাদে, জল দিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। নিজেকে আশ্চর্যভাবে চিনতে পারলাম আজ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একজন খারাপ মানুষ থাকে, তাকে কিছুতেই জাগতে দেয় না পৃথার মতো মেয়েরা। সেটা তো আসল মানুষ নয়, আসল মানুষ এই এখন চেয়ারে বসে আছে।

পৃথা আমাব পাশে বসে। বসে থাকতে থাকতে সহসা আমার হাত দুটো ওর মুখে তুলে নেয়। তারপর খুব ক্ষীণ একটা কাঁপুনি ধীর ধীরে ওর শরীর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উঠতে থাকে। ওটা যে কান্নার চাপা আবেগ পৃথাকে দুমড়ে মুচড়ে কাঁপিয়ে তুলছে বুঝতে পারি না। ক্রমশ পৃথার কণ্ঠে সেই কান্না শব্দ হয়ে ফুটতে থাকে। একসময় পৃথা ডুকরে ওঠে, সে দিশেহারার মতো আর্তনাদ ছড়িয়ে দেয়। বলে, আমি কী ভীষণ খারাপ! কত নোংরা মেয়ে! তাই না তপন দা?

আমার হাতের পাতা পৃথা ভিজিয়ে দিচ্ছে চোখের জলে। কী আশ্চর্য! এখন আমার হাত দুখানা, এই মুহূর্তে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর গালে, ওর মুখের পাতায়। আমার সামনে দণ্ডায়মান এই নারী আমার বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে সুগন্ধি এক

ধূপ। সেই ধূপের সুগন্ধে হাতের পাতা কেবলই ভিজে যায়। জীবনের ঘৃণিত পঙ্কিল অশ্লীলতার অন্ধকার থেকে ক্রমস্ফুটিত এক সঙ্গীত ধূপের ধোঁয়ার মতন পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে।

ওদিক থেকে আকাশে উঠে আসে সোনার ডিমের মতো পাণ্ডুর চাঁদটা। প্রতিবিম্বটা বারবার ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে গঙ্গার জলে। আলোর একটা রেখা স্তম্ভের মতো স্থির হতে গিয়েও জলের তোড়ে নড়ে উঠছে বারবার। সমুদ্র সৈকতের মতোই বিবর্ণ চন্দ্রালোকে নির্জনে স্থবিরতায় আবিষ্ট হলাম আমরা দুজনে। দীর্ঘক্ষণ আর কোনও কথা হল না। এক সময় উঠে পড়ল পৃথা, সঙ্গে আমিও।

পৃথা আমাকে ডেকেছিল—কী হল? এই আহ্বান ছিল মোক্ষম।

মেঝেয় বসে আমি তখন খাবারের সাথে বিলেতী গিলছিলাম। অভ্যেস ছিল না—দু গ্লাস খেয়েই মনে হল ঘরের সব কিছু দুলছে। তারপর কী কী ঘটেছিল মনে নেই। আবছা মনে হচ্ছিল—দুলতে দুলতে খাটের দিকে গিয়েছিলাম। পৃথা উপুড় হয়ে শুয়েছিল।

রোদ গায়ে লাগলে চোখ খুলে দেখি, মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি। মুখের চারপাশে বমি। মাছি ভনভন করছে। জানালার বাইরে ঝলমল করছে রোদ। বোঝা গেল—অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

পৃথা কই? পৃথা! আমি ডাকলাম।

কোনও সাড়া পাই না। হোটেলের ছেলেটার কাছে জানতে পারলাম ভোরবেলাতেই পৃথা চলে গেছে। ও এমনভাবে কথা বলল যেন ওদের বিলটা আমি তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিয়ে বিদেয় হই।

পাওনা তো মিটিয়ে দিতেই হবে। দেনা-পাওনা মেটাতেই তো বেঁচে থাকা। এই তো কেমন পৃথা ও আমি পরস্পর পরস্পরের দেনা পাওনা চুকিয়ে যে যার দিকে সরে পড়লাম।

কিন্তু পারলাম কই? সেই তো পৃথাদের বাড়িতেই তো যেতে হবে। জানতে হবে ও ফিরেছে কি না। ও আর আমার ডাক শুনে ব্যস্ত হবে না। নিজের যৌবনের আলোয় আমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার সুখে আর হয়তো খেলবে না।

এইসব ভাবতে ভাবতে ওদেরই বাড়ি ফিরলাম। দুর্বল শরীর, মাথা ঘুরছিল। দরজা দিয়ে ঢুকতেই শোভনা বলল, পৃথা সেই দুপুর থেকে বসে আছে দেখ গিয়ে। কোথায় গিয়েছিলে?

নরকে। বলেই দ্রুত সরে গেলাম। শোভনা অবাক চোখে দেখছিল আমার ঘরে ঢোকা। দেখলাম—হ্যাঁ পৃথাই আমার জন্য বরাদ্দ ঘরে বিছানায় বসে আছে।

কোনও কথা বলি না। নিজের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিই। হস্টেলে ফিরবার কথা বললাম শুধু সঞ্জয়কে। সঞ্জয় একটা ছেঁড়া-খোড়া হাতে তৈরি কাগজের খাতা আমার হাতে দিল। বলল, দাদুর লেখা, পড়ে দেখবি।

ঝরনা কলমে গোটা গোটা অক্ষরে ছবির মতো হাতের লেখা। সবটা নেই। তবু যা আছে পড়তে পড়তে মনটা চলে যায় অনেক পিছনে। বর্ণনা এমন যেন মনে হয় সব চোখের সামনে দেখছি।

অনেক পুরনো কথা, অনেক পুরনো কাহিনি লেখা রয়েছে পুরনো কাগজের পাতায়। বেশ ভারি একটা পাণ্ডুলিপি। অর্ধেকের ওপর পোকায় খাওয়া, ধুলো জমে জমে ময়লা হয়ে নোনা ধরে গিয়েছে। খেরো খাতায় বাঁধানো এই পাণ্ডুলিপি। লেখক পলাশ চক্রবর্তী। সঞ্জয়ের দাদু। পাণ্ডুলিপির শিরোনাম কী ছিল তা অবশ্য জানবার উপায় নেই।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা তুই কোথায় পেলি?

সঞ্জয়দের অবস্থা এককালে বেশ ভাল ছিল। বিরাট বাড়ি। সরু-সরু পাতলা-পাতলা ইটের তৈরি। এখন সব নোনা ধরে গেছে। এক সঙ্গেও পুরো বাড়িটা হয়নি। পুরুষাণুক্রমে এক মহলের পর আর এক মহল উঠেছে। সঞ্জয়দের দিকটা নতুন করে সামান্য মেরামত করা হয়েছে। ওর কাকার দিকটা পুরনোই আছে তবে ভাল অবস্থায়। ওর বড় কাকা বাড়ির বড় অংশটাই দখলে রেখেছে অবশ্য তার অনেকটাই এখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সঞ্জয়দের ইলেকট্রিক আছে, সেই সুবাদে ওর ছোট কাকারও আছে। তবে ওর বড় কাকার দিকটা পুরোপুরি অন্ধকার, তা ছাড়া কেউ থাকেও না—সব বন্ধ।

বারান্দায় টিম টিম করে একটা বাল্ব জ্বলছে। ওই আলোতেই কতগুলো ছেলেমেয়ে দুলে দুলে পড়ছে। ওগুলো সব পৃথার ছাত্র-ছাত্রী। বাড়ির ওই ঘরগুলো রাস্তা থেকেও নিচু হয়ে গিয়েছে। তাই কখনও কখনও সাপ-খোপ ঢুকে পড়ে। ভাঙা ইটের দেওয়াল থেকে কাঁকড়া বিছে বেরোয়।

সঞ্জয় বলল, ওর মধ্যে তুই কী পেলি তাই বল?

সাংঘাতিক জিনিস। তোর দাদু সংসারী মানুষ হলেও রীতিমতো বাবুয়ানি করেছেন। যেমন অর্থ উপায় করেছেন, ফুর্তিও করেছেন দেদার। ভাল ভাল জিনিস খেয়েছেন পরেছেন আবার দশজনের মাথার ওপর মাতব্বরিও করেছেন।

এসব কথা কি লেখা আছে নাকি এখানে?

সেইটেই তো দেখছি। পাতা তো সব নেই, অর্ধেক আবার ছেঁড়া, পোকায় খাওয়া।

আমায় কিছু দিনের জন্য এটা দে, সময় নিয়ে পড়ে দেখতে হবে।

সঞ্জয়ের আপত্তি ছিল না। বলতে গেলে ওদের কাছে এ পাণ্ডুলিপির কোনও দামই নেই। পুরনো বাড়ি মেরামত করতে গিয়ে চিলেকোঠার ঘরে অনেক কিছু জঞ্জালের মধ্যে এটা পাওয়া গিয়েছে।

হস্টেলের ঘরে পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে কতগুলো পর্দা। পুরনো সামাজিক পটভূমিকায় লেখা একটি চিত্রনাট্য। অক্ষরগুলো যেন চোদ্দো হাজার ভোল্টের উজ্জ্বলতা নিয়ে আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তখনকার, সমাজজীবন, বাড়ি ঘর, রাস্তা, সভ্যতা, শিক্ষা সব নিয়ে এক সাথে আমার সামনে এসে হাজির হল। তখন পিচের রাস্তা হয়নি। রাস্তায় জ্বলেনি ইলেকট্রিকের আলো।

দুপাশ মাঠ। মেয়েদের সিঁথির মতো একটা পায়ে চলা পথ মাঠটাকে দুফালা করে দিয়েছে। রোদ ঠা-ঠা করছে চারদিকে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবার জোগাড়। আটজন পালকি বেহারা হুসহাস শব্দে পালা করে বয়ে নিয়ে চলেছে একটা দেখবার মতো পালকি।

দূর থেকে পালকি কাছে আসতেই পালকি-বেহারারা থেমে গিয়েছে। পালকির দরজা ফাঁক হয়ে গেল। প্রধান বেহারা সসম্ভ্রমে মুখ বাড়িয়ে বলল, মাঠান, এখানে আপনাকে নামতে হবে। আমরা পৌঁছে গেছি। পালকির দরজা ফাঁক হতেই পালকি থেকে বের হয়ে এলেন একজন সুন্দরী মহিলা। বেরোতে গিয়ে ঘোমটাটা খসে গেল মুখ থেকে।

বেহারারা সকলেই এক পলকে দেখে ফেলল সুন্দরীর মুখখানা। দুপুরের রোদে মুখখানা লাল হয়ে গিয়েছে। ফরসা রং এর ওপর লালচে আভা বেরোচ্ছে সারা মুখে। আর কপালের ঠিক মধ্যিখানে সিঁথি বরাবর জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

সামনের বেহারা দুজন সেইদিকে চেয়েছিল। তাদের দিকে নজর পড়তেই প্রধান বেহারা নিজেকে কেমন অপরাধী মনে করল। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুন্দর মুখখানা খানিকক্ষণের জন্য ভোলবার চেষ্টা করল।

পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকেই রয়েছে এই বর্ণনা। অসম্ভব সুন্দর একটা চিত্রনাট্য। ধুলো আর নোনা হাওয়া আর পোকার হাত থেকে পাণ্ডুলিপিখানা রক্ষা করা যায়নি। এদেশের জলহাওয়ায় অযত্নে অবহেলায় মানুষই মরে যায়, তায় আবার কাগজ।

পঞ্চাশ একশো বছরে শুধু যে সময় বদলেছে তাই নয়, মানুষ বদলেছে, মানুষের মতিগতিও বদলেছে। আর শুধু মানুষই কেন বদলে গেছে এই বিস্তীর্ণ এলাকার ভূগোল।

ঠিক এ পর্যন্ত এসেই পাতাটা শেষ। এরপর আর নেই। অনেক খুঁটেও আর উদ্ধার করতে পারি না। পুরনো কিছু পড়ার এই একটা অসুবিধা, যেখানে কৌতূহলটা ঠিক ঘন হয়ে আসছে সেই জায়গাটাই বেছে বেছে পোকায় কাটে অথবা হারিয়ে যায়।

কিছুদিন পর সঞ্জয় আরও কিছু পাতা যোগাড় করে নিয়ে এল। এগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে এল। হস্টেলের ঘরগুলোতে একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু আমি একলা জেগে আছি।

পলাশবাবু তাঁর চিত্রনাট্যে বিভিন্ন জায়গায় তখনকার যে জীবন-কথা লিখেছেন তা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দুনিয়াটা এখনও যেমন রূপ আর লালসার পিছনে ছোটে তখনও সেইরকই ছিল। মেয়ে মানুষের দেহ আর অর্থ উপার্জনের কলাকৌশল আয়ত্ত করাকেই সেদিন চরম মোক্ষ বলে জ্ঞান করেছে সবাই। টাকা চাই। যেমন করে হোক রোজগার করতে হবে। জীবন অনিত্য। জীবদ্দশাতেই তাই ভোগের চরম পরিতৃপ্তি চাই। সমাজের ধনীদের খাতির যত্নই যদি না পেলাম, সুন্দরী নারীদের যদি ভোগ করতে নাই পেলাম—এ জীবনে কিসের মোক্ষ লাভ?

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, তারপর কী? তারপর?

বললাম, দাঁড়া একটু সবুর কর। পাণ্ডুলিপিটা সাজাতেই পারছি না। কোনটা প্রথম অংশ আর কোনটা শেষের কিছু বুঝতেই পারছি না। তবে একটা ছবি যেন ভেসে উঠছে। একটা লম্পট জমিদার বাঘ শিকার করতে গিয়ে এক সুন্দরীকে ঘরে তুলে নিয়ে এল। গল্প বড় মোচড় দিয়ে বলা হয়েছে। একটুখানি পড়লেই পরের পাতা পড়বার জন্য মনটা ছটফট করে। অথচ সেই পরের পাতাটা আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

সত্যিই পলাশ চক্রবর্তী আমায় কদিন ধরে একেবারে নেশাগ্রস্ত করে রেখে দিল। অন্য কিছু চিন্তা করতেই দিল না।

পাণ্ডুলিপিটা যখন পড়া শেষ হল তখন গভীর রাত। চরিত্রগুলো সব যেন সজীব হয়ে আমার আশেপাশে চলাফেরা করতে লাগল। এরকম একটা চলচ্চিত্র যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হল। হ্যাঁ ঠিকই, নামটা মনে পড়েছে—লাল পাথর।

এমনি করেই ভোর হয়ে গেল। শেষ রাতে নামল বৃষ্টি। আলো ফোটেনি ভাল করে বারান্দায় এসে দেখি বর্ষার আকাশ অনড় হয়ে আছে মেঘে। জয়নগর থেকে আসার আগের দিন সন্ধ্যায় পৃথা ধরেছিল, চলে যাবেন? আপনি চলে গেলে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। থেকেই যান না আরও একটা দিন।

আমার হাতখানা ও ধরে রেখেছিল নিজের শক্ত মুঠোর মধ্যে। দম টেনে হেসে বলেছিলাম, পাগল মেয়ে।

এক ঝটকায় হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

ও চলে যেতেই একঝাঁক স্তব্ধতা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল ঘরে।

মেসের ঘরটা যেমন রেখে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিই আছে। তবু মনে হয় ঘরটা মলিন হয়েছে আরও, বিছানায় নোংরা জমেছে আগের চেয়ে বেশি। ঘরময় ঝুল জমেছে প্রচণ্ড। চারপাশে বড্ড বেশি অন্ধকার। খুব বদলে গেছে আবহাওয়াটা।

মেয়েদের বিয়ে না-হাওয়াটা এ সমাজে যেন ভয়ঙ্কর অপরাধ। আবার বিয়ে হলেও কত সমস্যা! লেখাপড়া শিখে যে চাকরি করবে সে সুযোগও কম। সুন্দর মুখের আকর্ষণ থাকলেও চেহারা ভাল, গায়ের রঙটা চাপা, ছেলে কেনার টাকা যদি না থাকে বাবা-মায়ের হাতে তবে সে মেয়ে সংসারের বোঝা।

শোভনার ডাগর চোখে জল। ওর পিঠে ছড়িয়ে থাকা দীঘল ঘন চুল, মেদহীন দীর্ঘ কালো শরীরের লাবণ্য অথচ পানপাতার মতো মুখে নীল আতঙ্ক আমার দু-চোখের সামনে ভাসে।

জীবনের মূল্যটাকে বুঝে চলতে হয় বুঝলে? নইলে বিপদ বাড়ে। হঠাৎ একদিন মনে হয় বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখন আর ফেরার পথ থাকে না। জীবন ফুরিয়ে যায়। পাল্টাবার বা নতুন করে শুরু করার আর সময় থাকে না। শোভনার মুখে এসব দার্শনিক কথাবার্তা শুনে চমকে উঠেছিলাম।

মানুষ সারা জীবন ভবিষ্যৎ সুখের কথাই ভেবে যায় আর আবেগে ভুল করে বসে। অবশ্য কিছু কিছু ভুল শোধরানো যায়। যাদের সাহস আছে তারা চেষ্টা করে। সবাই পারে না।

শোভনার এসব কথা আমাকে কষ্ট দেয়। মনে হয় ওর কষ্টগুলো যদি নিজের শরীরে নিতে পারতাম! ওর সব দুঃখগুলো যদি আলতো করে তুলে নিয়ে নিজের হৃদয়ে ধারণ করতে পারতাম! রান্নাঘরে কথা বলছিলাম ওর সাথে। শোভনা রান্না করছিল। বললাম, কাউকে এত কাছ থেকে রান্না করতে দেখিনি। তুমি পেঁয়াজ কাটছ, রান্না করছ, থালা ধুচ্ছ এসব আমি নিজেও কোনও দিন করিনি।

এক বাটি পেঁয়াজ কুচোনো কড়াইয়ে ছেড়ে দিয়ে শোভনা বলেছিল, আমিই কি ছাই কোনও দিন করেছি?

তেলে পেঁয়াজ চিঁচি করছিল। পেঁয়াজ থেকে চোখ সরিয়ে নাড়তে নাড়তে মিষ্টি হেসে বলেছিল শোভনা, দুদিন আরও থেকে যাও না? তোমায় কিছু রান্না শিখিয়ে দেব, বউয়ের উপকারে লাগবে। অবশ্য আমিই কি ভাল রান্না জানি! এ তো মায়েদের কাজ, বলে কোনদিন রান্নাঘরেই ঢুকিনি আগে।

সত্যি এসব মায়েদের কাজ। ছোট থেকে এরকমই দেখেছি। মা রান্না করে, সবাইকে খেতে দেয়। গল্প করতে করতে সবাই খায়। মা এটা-সেটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু মা খেতে বসেছে সবার শেষে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। মানুষের ভিড় যানজট শব্দযন্ত্রণায় কাতর হই। ফুটপাতের খাবার খেয়ে পেটের অসুখ বাধাই। একা একা নন্দনে ছবি দেখি। সঞ্জয় আসে, ওদের বাড়ি যেতে বলে। যাই না। এমনি করে পরীক্ষা দিই। পরীক্ষা শেষ হয়। হস্টেল এখন ফাঁকা। আমার কোথাও যাবার নেই তাই থেকে গিয়েছি। সঞ্জয় বারবার করে বলছিল ওদের বাড়ি যেতে। ভাল লাগেনি।

এখানে রাতগুলো আগের চেয়ে আরও বেশি স্তব্ধতায় জলে ডুবে থাকে। কোথাও গেলে এমন হয়তো মনে হতো না। কিন্তু বেড়াতে গেলে টাকার প্রয়োজন। আমার কাছে সেরকম টাকা নেই। মাস ফুরোলে এক গাদা খরচ। বাড়ি থেকে গোনা গুনতি টাকা আসে। সে টাকা বন্ধ হলে পথে বসতে হবে। অথচ সবার বিশ্বাস আমার হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কেউ জানে না কারও কোনও সমস্যার সমাধান করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ সবাই তার সমস্যার কথা আমায় বলবেই। এই দুর্লভ নির্জনতাই আমার তাই প্রিয় ঠাঁই।

সারাদিন এখানে ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় হস্টেলে ফিরে আসি। দেখি সঞ্জয় বসে আছে। বলে, পৃথা আত্মহত্যা করেছে।

পৃথা আত্মহত্যা করেছে?

অভাবনীয়! আমার পায়ের তলার মাটি কি দুলে উঠল? পৃথার মুখটা আমার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষর হয়ে ভেসে ওঠে। আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে থরথরিয়ে কেঁপে ডেকে ওঠে, পৃথা—।

আমার গলার আওয়াজে ফাঁসির আসামির মতো চমকে ওঠে সঞ্জয়। সে ভীত বিহ্বল দৃষ্টিতে আমাকে দেখে।

মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায়। চোখে অন্ধকার দেখি। শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হয়। সঞ্জয় ধরে ফেলে আমাকে। এ সমাজ বড় কঠিন ঠাঁই। মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলবে তা হবে না। সে বিপথে চালিত হবে, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে—সে মালমশলা জুগিয়ে দেবে। সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার মৃত্যু হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েদের দো-মনা খুশির মস্করা সহ্য করবে, অতটা দুর্বল নয় এই সমাজ।

পৃথা নেই, পৃথা মৃত। পৃথার গালে নেই রক্তাভা। পৃথার মুখ এখন ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, ওর মুখে নেই এখন দুনিয়ার ছায়া। পোস্টমর্টেমের ঘরের টেবিলের উপরে ঝালরওয়ালা একটি চাদরে ঢাকা চিরনীরব এখন পৃথার শরীর। এই নীরবতা

হিমশৈলের মতো কঠিন শক্তিমান। এই শক্তি বিদ্যুৎচমকের মতো শতফলায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আকাশের মতো বিশাল অন্তহীন এক নীরবতা আমাকে কুঁকড়ে দেয়। যাদবপুর থেকে জয়নগর সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করি। কিসের একটা ভয় যেন আমাকে পিষে ধরে। কিসের ভয়?

গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে ফ্যানে ঝুলে গত রাতে আত্মহত্যা করেছে পৃথা। ওর দেহটা এখন শোয়ানো আছে একটা বাঁশের চৌদোলায়। কপালে কাটা দাগ—ময়না তদন্ত হয়ে গেছে। শরীরটা পলিথিন দিয়ে মোড়া। ডোমরা বোধহয় ভাল করে সেলাই টেলাই করে দেয়নি। এসব ব্যাপারে ওদের বাড়তি চাহিদা থাকে। দিতে না পারলে দায়সারা কাজ করে দেয়। কে একটা ভাল শাড়ি পৃথার ওপর বিছিয়ে দিয়েছে। গলায় গাঁদা ফুলের মালা।

ও বেঁচে থাকলে বোধহয় এরকম মালা ওর গলায় পরানো যেত না। লোকে দেখতে এসে বলছে, আহা কী সুন্দর মুখ গো! মেয়েটার স্বভাব চরিত্র, কী বলব...।

মাসিমা কাঁদছেন। শোভনা ওঁকে ধরে রেখেছে। এই কাঁদাটা কেমন যেন। মনে হল এই কান্নার মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততার ছোঁয়া যেন আছে। দুশ্চিন্তা কেবল শ্মশানঘাট আর শেষকৃত্যের। পৃথা এ জন্মের মতো জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথা আত্মহত্যা করে নিজে বাঁচল, না বাড়ির মানুষগুলোকে বাঁচাল জানি না। তবে ও কাউকে নিশ্চয় বাঁচাল!

পৃথার ঘরে চোখ বুলোই। ওর বিছানা, বালিশ, বইপত্র, শাড়ি, তানপুরা, হারমোনিয়াম সব ঠিক ঠিক আছে। কেবল ও নেই।

সঞ্জয় বলে, কাজ কর্মগুলো চুকিয়ে দিয়ে যা।

ওকে বলি, এসব কাজে আমার এতটুকু আগ্রহ নেই।

ওর আত্মা কষ্ট পাবে। এমন করিস না।

যাব বলেও তাই যাওয়া হয়ে ওঠে না। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাতে ওর ঘরে ঢুকি। এই ঘরে পৃথা বলে একটা মেয়ে ছিল। দাপটের সঙ্গে বেঁচে ছিল। এখন সে নেই। মানুষ এমনি ভাবে আসে যায়। আমরা এমনি করে ভেসে যাই। আচ্ছা! পৃথাকে প্ল্যানচেট করে দেখলে কেমন হয়! জানা যাবে কেন ও আত্মহত্যা করল?

তুই কি পরজন্মে বিশ্বাস করিস?

দেখি সঞ্জয় এসে দাঁড়িয়েছে। মাথা নাড়ি, না।

তবে?

পৃথাটা কেমন বোকার মতো চলে গেল না?

ছেলেমানুষ!

একবার ভাবল না জীবন এতো ঠুনকো নয়।

উঠোনময় পিণ্ডিগুলো ছড়িয়ে আছে। পাখিতে এসে খাবে। পাখি বলতে তো কাক। ওরাও আসে না। এর থেকে ঢের ভাল খাবার ওদের জোটে। সঞ্জয় শোকবস্ত্র পড়েই স্নান করেছে। গায়েই কাপড় শুকোচ্ছে। অপঘাতে মৃত্যু তাই তিন দিনে শ্রাদ্ধ। যতোসব অদ্ভুত রীতি। ওকে বলি, ইস কী অবস্থা তোর। শরীর খারাপ হবে যে।

বাদ দে। দুটো তো দিন। ক্লান্ত গলায় বলে সঞ্জয়।

ঘরের গুমোট গরম থেকে দাওয়ায় বের হয়ে আসি। সঞ্জয় পাশে এসে বসে। লক্ষ্মীপুজোর দিন রাত্রে এখানে বসে গান গেয়েছিল পৃথা।

একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলেম নয়ন জলে—। অতুলপ্রসাদ সেনের গান, চমৎকার গেয়েছিল পৃথা। কানে এখনও লেগে আছে। পৃথার গানের থেকে পৃথাকেই আমার বেশি ভাল লাগত। কিন্তু নির্জনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গুনগুনিয়ে উঠলে আমার বেশ ভাল লাগত। এই ভাল লাগাটা কি? আমি জানি না।

পৃথা বলেছিল, ভাল লাগার মানে কাছে পাবার ইচ্ছা। আপনাকে কাছে পাবার তেমন সময় পাইনি। চাইলে কাছে তো পেতামই। কেবল নিজের কাছে পরিষ্কার হতে পারলাম না। আসলে আমি কী চাই নিজেই জানি না।

নিজেকে প্রশ্ন করি, আমিই কি নিজের কাছে খুব স্পষ্ট? যৌবনের আলোয় নিজের ছায়ার সঙ্গে আমাকে বুড়িছোঁয়া করে ওর লুকোচুরি খেলা চলছিল যেন। সজলরা আসার পর পৃথার উদ্দাম ঘনিষ্ঠতায় ভাঁটা পড়েছিল।

কোথাও মিউজিক সিস্টেমে বিকট শব্দে একটা উৎকট মিউজিক বাজছে। কী বিশ্রী সব গান। গান তো নয় যেন ষাঁড়ের লড়াই চলছে। গুঁতোগুঁতির যেন শেষ নেই।

পৃথা থাকলে বলতো, দেখুন রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের গানের কথাতে কোনও বিশ্রী শব্দ নেই। গান শুনলে মন ভরে যায়। চোখের সামনে অন্য এক পৃথিবীর দরজা খুলে যায়। আর এখন কী যে সব গান শোনে লোকে। বিশ্রী বিশ্রী সব কথা! শুধু চেঁচানো আর উত্তেজনা। উত্তেজনাই যেন সব। অথচ ওটা কত সাময়িক ব্যাপার বলুন তো?

উত্তেজনা খুবই সাময়িক ব্যাপার। এটা সরল সত্য। ইচ্ছে করলেই পোশাকের মতো সব কিছু বদল করা যায় না। তা হলে আর এই জগতে সব কিছু ঠিকঠাক চলতো না। এক দুজনকে নিয়ে জীবন নয়, সবাইকে নিয়ে জীবন।

নিমপীঠের রাস্তায় যখন দুজনে হেঁটেছি। পরস্পরের শরীরে ছোঁয়া লেগেছে। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে কী কারণে পৃথা হেসেছে। এত কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কথা বলেছে যে ওর নিশ্বাসের বা ওষ্ঠাধরের ভিতর দিকের গন্ধ আমি পেয়েছি, আমারটাও হয়তো ও পেয়েছে।

ওদের বাড়ি এসে একবেলা ওর সাথে দেখা না হলে, ও নিজে এসে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গেছে। বড় ভয় করত আমার। একটা ঘরে আমরা দুজনে অসংলগ্ন কথা বলতাম। আমাদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে বিশৃঙ্খল আলোচনা হতো। কোনও সময়ে বিতর্ক উঠলেও দুজনে একটা সহজ স্বাভাবিক বৃত্তকেন্দ্রে পৌছতে চেয়েছি।

সঞ্জয় আমার পাশে বসে। দুজনের কেউ কোনও কথা বলি না। অন্ধকার রাতের ঘোলাটে আকাশের দিকে উদাস তাকিয়ে সঞ্জয় নীরবতা ভাঙে।

তুই চলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

এবার কী করবি?

হস্টেলেই থাকব।

থাকতে দেবে?

যতদিন দেয়। এমনি করে যতদিন চলে যায় এই আর কি।

এভাবে আর কতদিন চলবে?

যতদিন চলে।

এবার সিরিয়াসলি কিছু কর।

আমি হলুম ভবঘুরে। যাদবপুরের দানাপানি আমার যে কোনও দিন ফুরিয়ে যাবে। তারপর কী করব কোনও ঠিক নেই। অবশ্য ওখানে যতদিন থাকব ততদিন তোদের ভরসাতেই আছি। কিন্তু তারপরে কী যে হবে তা আমিও জানি না।

সঞ্জয় বিস্ফারিত চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, আচ্ছা তপন, সত্যি বল তো, তুই কী চাস?

শান্ত ভাবে বলি। আমি কী চাই। তাই তো, আমি কী চাই? এভাবে ভাবিনি রে। সেই কান্দীর একটা গ্রাম থেকে হাঁটতে শুরু করেছি। এ পর্যন্ত এসে পৌঁছিয়েছি। এরপর কী হবে, তা নির্ভর করছে ঈশ্বরের মর্জির ওপর। আমি তবে আসি।

উঠে দাঁড়াই। মাসিমার কাছে, শোভনার কাছে বিদায় নিই। সঞ্জয় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। আমাকে জড়িয়ে ধরে। বিষাদ গলায় বলে, তপন, তুই চলে যাবি। শূন্য এই বাড়িটায় আমায় থাকতে হবে।

আস্তে আস্তে বলি, দেখ ভালবাসা কি শুধু চোখেই? ভালবাসা হয় প্রাণে।

আর দাঁড়াই না। এবার হয়তো আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসবে। এতক্ষণ সঞ্জয়কে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। আমাকে কে সান্ত্বনা দেবে? পৃথা নেই। এ জায়গাটা তো আমার বুকেও শূন্য ছাড়া আর কিছু নয়।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসি। বাগানের দিক থেকে দুটো বেড়াল লেজ গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। একটা পুরোপুরি কালো। অন্যটা সাদায় কালো মেশানো। হঠাৎ পাশের দিকে নজর পড়তেই মনে হল কে যেন উঁকি দিয়ে আমায় দেখছে। একটা বীভৎস মুখ, কপালের চামড়া উঠে গেছে, ঠোঁট দুটো নেই।

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু খানিক পরে আবার চোখ ফেরাতেই সমস্ত শরীর যেন আতঙ্কে হিম হয়ে উঠল। ওই মুখটা যেন দাঁত বের করে হাসল। আমার দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করল। মনে হল বীভৎস মূর্তিটা যেন আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। ভয়টাকে আর চেপে রাখতে পারলাম না। আর্তনাদ করে উঠলাম—আঁ—আঁ—আঁ—

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কারা যেন দৌড়ে আসছে। অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম শব্দ করে যেন কারা দৌড়ে নিচে নামতে লাগল। তারপরে আর আমার জ্ঞান ছিল না।

ট্রেনের জানালায় বসে আছি। বহড়ুতে পাশে এসে বসল একটা মেয়ে। কটা কটা চোখ, কটা চুল। মুখ খানা নিচু করে এসে জানালার ধারে বসতে চাইল। সরে গিয়ে জায়গা করে দিলাম।

বয়স কত হবে একুশ কি বাইশ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি—পৃথার সঙ্গে এ মেয়ের কোনও মিল নেই। পৃথা ছিল আগুনের মতো। স্মৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়াই না এরকম কোনও মুখ নেই। পড়নে মেরুন রঙের

শাড়ি, ব্লাউজের রংও ওই, কানে দুটো হালকা দুল, কোঁকড়ান এক মাথা চুল। গায়ের রঙ বেশি সাদা। রোদ্দুরের রশ্মিতে মুখখানা ঝকঝক করছে। ভুরু ও চোখের পাতা কালচে লাল, এঁকেছে কি না বুঝতে পারলাম না।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অল্প হাসল। আমিও হাসলাম।

বাইরে কী দেখছেন এত?

জড় পদার্থের ছোটা দেখছি।

গাছপালা বাড়িঘর সব সরে সরে যাচ্ছে। এসব দেখতে দেখতে বললাম, অদ্ভুত। এভাবে কেউ কোনও দিন বলেনি। কোথায় নামবেন?

শিয়ালদহ।

গাড়িতে এখনও অফিস যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়নি। ওর উদাস চোখ, এলো চুল, ঠোঁটের নিচে কালচে লাল তিল, থুতনিতে ছোট্ট কাটা দাগ, জানালায় মাথা রেখে বাইরের দুরন্ত ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা—একটা দুঃখী দুঃখী ছায়া ফেলেছে।

কলকাতায় কি পড়াশোনা?

নাহ!

তবে?

কাজ করতে।

চাকরি?

হ্যাঁ। কম্পিউটার।

বাহ! আপনি তো ভাগ্যবতী।

এমন কিছু আহামরি চাকরি নয়।

না হোক। আপনি তো আর বেকার নন।

আপনি বুঝি বেকার?

হান্ড্রেড পার্সেন্টি। আমি তপন সেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেকার।

এভাবে কেউ পরিচয় দেয় নাকি? আমি হামিদা বানু।

হামিদা। অর্থাৎ ...

না এর মানে কী আমি জানি না।

ধীরে ধীরে ওর সব কথা জেনে নিই। এইচ এস করে ডিটিপি করেছে। দু বছর হল একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। কিরকম মাইনে পায়, বাড়িতে কে কে আছে আরও ব্যক্তিগত তথ্য বের হয়ে আসে। বাবা সরকারি আধিকারিক। মা গত হয়েছেন।

ডিটিপি শিখেই কাজটা পেয়ে গেছে তাই আর পড়া হয়নি। ট্রেনের কামরায় ভিড় বাড়ছে। অনেকেই হামিদাকে লক্ষ্য করছে কেমন একটা কুৎসিত ভঙ্গিতে। কেউ বুক চিতিয়ে, কেউ ঘাড় উঁচিয়ে, কেউ কেউ এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন উটের মতো। এই এক জ্বালা। কোথাও কোনও সুন্দরীর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা যাবে না। এমন কী সেই সুন্দরী নিজের স্ত্রী হলেও। সবাই উঁকি ঝুঁকি মারবে। এর আগে কোনও অহিন্দু মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

ওর কটা চুল উড়ে এসে আমার গালে লাগছে। একটা সুগন্ধ নাকে লাগে—

বোধহয় শ্যাম্পুর। হামিদা বারবার চুলগুলো সরিয়ে নেয়। বারবার চুলগুলো চলে আসে। আমার এই আবেগ আর কিছুক্ষণ পর নিভে যাবে এই আশংকায় গম্ভীর হয়ে যাই। মনে মনে ভাবি শিয়ালদহে পৌঁছে হামিদা স্মিত হেসে হাত নেড়ে মৌলালির দিকে ওর অফিসে চলে যাবে। আমি ফিরব যাদবপুর। বালিগঞ্জ এসে গেছে। আর তো সামান্য সময়।

কিন্তু আমাকে অবাক করে যাদবপুর পৌঁছতেই হামিদা বলে, খুব তাড়া নেই নিশ্চয় আপনার। যাদবপুর তো, প্রচুর গাড়ি আছে। চলুন আমার অফিসে। এক কাপ চা খেয়ে এলে খুব ক্ষতি হবে না আপনার।

নাঃ। আমার আর নতুন করে কী ক্ষতি হবে?

আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল হামিদা ধরে ফেলে। বলে, এরকম ভাবে বলছেন কেন?

ওকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করি—না, এমনি।

হামিদা কিছু বলে না। শিয়ালদহে গাড়ি এসে ঢোকে। একে একে সবাই নেমে যায়। নতুন করে আবার লোক উঠতে থাকে। নামলাম দুজনে। গেট থেকে বের হয়ে পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ মাত্র। স্নিগ্ধ সুন্দর সকালটা ভাল লাগে। ফুসফুস ভরে বাতাস নিই। বাতাসে বসন্তের ঘ্রাণ পাই। এন আর এস হাসপাতালের ভেতর চোখে পড়ল একটা বড় গাছে কমলা রঙের বড় বড় ফুল ফুটেছে। কী ফুল জানি না।

সুন্দর সাজানো গোছানো অফিস হামিদার। সোফায় বসে ঘরটা দেখি। আবছা আলো ঘরটায়। ভারী পর্দা দিয়ে পার্টিশন করা। এদিকে পরপর চারটে কম্পিউটার। মেয়েরাই বোধহয় কাজ করে এখানে। আর একজন মেয়ে এসে গেছে দেখলাম। সোফার পাশে একটা জানালা, সেখানে ঘর ঠাণ্ডা করার যন্ত্র বসানো আছে। হামিদা একটা পিওন গোছের লোককে চা আনতে বলল।

চা খেলাম।

এরপর আমরা আরও অনেক কথা বললাম। বিদায় নেবার পর মনে হল আরও কতো কথা বলা হল না।

হস্টেলের ঘরে ঢুকি ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে। একটা চার দেওয়ালের ঘর আর মাথার ওপর ছাদ জীবনে যে কত প্রয়োজনীয় আরও একবার ভীষণভাবে অনুভব করলাম। হাতে অনেক টাকা থাকলে কোনও হোটেল বা কারও বাড়ি পেয়িং গেস্ট থাকা যেত। পেয়িং গেস্ট থাকারও নানা ঝামেলা। কোনও স্বাধীনতা নেই। ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্ট আউট হতে এখনও তিন মাস লাগবে। ততদিন হস্টেলে থাকতে দেবে না। জুনিয়র কারও সঙ্গে শেয়ার করে অবশ্য থাকা যায়। অথবা সঞ্জয়দের ওখানে। না, তা আর সম্ভব নয়। আমার বুকের ভিতরে মিহি একটা কষ্ট পালকের মতো উড়ে এসে ঢুকে পড়ে। বিছানায় ছেড়ে দিই শরীরটাকে। এই কটা দিনে শরীরে অনেক ধকল গেছে।

অনেক সকালেই ঘুম ভাঙে। ঘর থেকে বের হই। এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখি। মানুষের ভিড় চারিদিকে। সবাই শরীর চর্চা করছে। বেঁচে থাকার ইচ্ছে কত তীব্র এই মানুষগুলোর মধ্যে। ইউনিভার্সিটি

ক্যাম্পাসের সব মানুষ। এমনিতে হস্টেলের এদিকটা বেশ নির্জন। পাখির ডাক শুনি—ভাল লাগে। পাখিটাকে দেখতে পাই না। হামিদার সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগ, তবু এক ধরনের আত্মীয়তা অনুভব করি। পৃথা, হায় পৃথা!

পৃথা একটা ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। বড্ড তাড়াতাড়ি এগোতে চেয়েছিল পৃথা। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটে। তারপর হয় ফল—একটা সময়ের ব্যাপার আছে। এই সময়টা দিতেই হবে, এখানে মানুষের কোনও হাত নেই। কুঁড়ি না চেয়ে ফুল, ফুল না চেয়ে ফল পাওয়া যায় না। পৃথা একেবারে ফল চেয়েছিল। পৃথা এমনটা কেন করল—এ প্রশ্নের উত্তর কোনও দিনই পাব না।

সময়ের পলগুলো আজকাল বড় দীর্ঘায়িত বলে মনে হয়। হামিদাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘুরতে গেলাম একদিন। শিল্প সাহিত্যে আগ্রহ আছে হামিদার। জানেও অনেক কিছু। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনেক কিছুই ঘুরিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দেয়। বলে, প্রিন্স অব ওয়েলস এই সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই সৌধকে ব্রিটিশরা নাকি নকল তাজ বলতো।

হামিদা জিজ্ঞেস করে, এসব দেখতে তোমার খুব ভাল লাগে না?

নিশ্চয়ই। গম্ভীর স্বরে বলি।

ইতিহাস তোমার প্রিয় বিষয় তাই না?

ভাল লাগে। আমি কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র। হাঁটতে হাঁটতে বলি ওকে।

সামনে দাঁড়িয়ে পথ আগলে জিজ্ঞেস করে হামিদা, তুমি সাহিত্য নিয়ে পড়নি কেন?

পাশ কেটে হাঁটি। পড়া হল না বলে।

হামিদা দাঁড়িয়েই থাকে, ওর ওড়না ঢিলে হয়ে খসে পড়ে যায়। হঠাৎ খেয়াল হয় যে আমি একা এগিয়ে যাচ্ছি। দৌড়ে আমার কাছে পৌঁছয়। আমার হাতটি ওর হাতের মুঠোয় নিয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছ?

ওকে বলি, চলো তোমাকে কোলকাতা শহর দেখাব। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকি। মেঝের ওপরে মহারানির মূর্তি দেখতে দেখতে উপরে উঠি।

এক ভদ্রলোক হামিদার ওড়নাটা দু আঙুলে ধরে এগিয়ে এলেন।

এই যে ম্যাডাম, এটা কী আপনার?

তুমি যে এত বেখেয়ালি, কি বলব!

হামিদাকে কোলকাতা দেখাই। গঙ্গার ওপর সেতু। শহিদ মিনার—সব। সৌধের চূড়োয় ঘূর্ণায়মান ব্রোঞ্জের কৃষ্ণ পরীকে দেখিয়ে বলি, ওটা দেখেছ, ওর নাম ভিক্টরি।

সিরাজদৌল্লার কালো মর্মর সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে হামিদা বলে, এসব তো ভারত গৌরব। ব্রিটিশদের নয়। তাহলে এসব ভিক্টোরিয়া সৌধে কেন?

ওকে বলি, ঠিকই, তবে এখানে ওটা ব্রিটিশ গৌরব হিসাবে শোভা পাচ্ছে। কারণ ব্রিটিশদের কাছে সিরাজ পরাজিত হয়েছিলো।

পরের ধনে পোদ্দারি! হামিদা মন্তব্য করে।

এটাই তো ব্রিটিশদের স্বভাব। গম্বুজের হুইসপারিং গ্যালারিতে হামিদা চুপ করে থাকে। ওকে কিছু বলতে বলি। বলে না—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফিসফিস করে বলি, হামিদা।

হামিদা আমার আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে হাতটিকে বন্দি করে। আমাদের চারপাশে কারা যেন ফিসফিস করে—হামিদা, হামিদা, হামিদা শব্দে।

ওকে লক্ষ্য করি, আনমনা।

ওই দালানটা দেখ। বিশাল একটা বাড়ির দিকে হাত দেখিয়ে হামিদা বলে।

ওকে বলি, ওটা টাটা সেন্টার। ওর পাশে ওই বড় বাড়িটা চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল, ওই জীবনদীপ ভবন। আরও ওদিকে ওই দ্যাখো যাদুঘর, গ্রান্ড হোটেল।

হামিদার চুল ঘাড়ের চারপাশে গড়াচ্ছে। পায়ে উঁচু জুতো। উঁচু পরেও আমার কাঁধের নিচেই পড়ে ওর কাঁধ। ভার বুক। পেটে চিকন মেদের ভাঁজ, এই মেদ মেয়েদের শরীরকে রমণীয় করে তোলে।

হামিদা হঠাৎ জানতে চায় এর আগে কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছি কি না।

কী বলব? কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। তারপর বলি, হ্যাঁ। পড়েছি।

সে এখন কোথায়?

ধীরে ধীরে বলি, প্রেমে পড়েছিলাম এক মেয়ের। সুন্দরী ছিল। কিন্তু সে মেয়ে..

ছিল বলছো কেন?

হ্যাঁ। সে এখন অতীত। কিছু দিন আগে সে সুইসাইড করেছে।

সুইসাইড?

হ্যাঁ।

সুইসাইড করল কেন?

সেটা তো আমাকে বলে যায়নি।

ও। না জেনে দুঃখ দিলাম।

হঠাৎ পৃথা এসে গেল। আবহাওয়াটা ভারী করে ফেলল। আমরা আমাদের বাইরে এলাম।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রাসাদের সংলগ্ন চত্বরটা কলকাতার হাওয়া বিলাসীদের কাছে আকর্ষণীয়। আমাদের পিছন দিকে একটা বেঞ্চিতে গল্প স্রোতের প্রবল প্রবাহ ভেসে এল। তাকিয়ে দেখি বয়স্ক এক ভদ্রলোক হাত দেখে বিচার করে নানারকম কথা বলছেন। তার সামনে এক এক করে সবাই হাত দেখাচ্ছে। যারাই তার সামনে বসছে নিতান্ত গো-বেচারার মতো হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক অতীত জীবনের কথা বলছেন, ভবিষ্যতের কথাও বলছেন। সমাগত বিপদের প্রতিকারের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করার বিধি ব্যবস্থার কথাও বলে দিচ্ছেন।

একের পর এক মানুষ হাত দেখাচ্ছে, আর তারা ওই সব কথা শুনে ভক্তিতে গদগদ হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে সমস্ত মেনে নিচ্ছে। আমার কৌতুহল বেড়ে গেল। হামিদাকে নিয়ে উঠে এলাম। গণক ঠাকুরের সামনে এসে বললাম, আমরা একবার হাত দেখাতে পারি?

ভদ্রলোক আমাদের দুজনকে দেখলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ? বেশ, বস দেখছি।

চারপাশের সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। জ্যোতিষ মশাই এর দম্ভ কঠিন মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। আমার হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

ধনস্থানে বৃহস্পতি অর্থাৎ যথেষ্ট অর্থাগম হবে কিন্তু জাতক তা ধরে রাখতে পারবে না।

উৎসাহ না-দেখিয়ে বলি, বিদ্যাস্থানে কী বলছে?

ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি বললেন, বিদ্যাস্থানে বুধ, কিন্তু শনির কোপ আছে, সেজন্য উপস্থিত সময় পর্যন্ত তোমার কিছু হতে দিচ্ছে না। ভবিষ্যতে তোমার অবশ্য মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বুদ্ধিতে তুমি ভাল হবে।

এবার হামিদার হাতটা বাড়িয়ে ধরি।

দেখুন তো ওর হাতটা।

গণক ঠাকুর দুরূহ শ্লোকরাশি আবৃত্তি করলেন জলদ গম্ভীর স্বরে। বললেন, জীবনে তুমি দুবার সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগেছ।

হামিদা অস্বীকার করে, বলে, না। একবারই মাত্র অসুস্থ হয়েছিলাম।

আরও একবার। তত বেশি না হোক, তবে তেমনি—

হামিদা বলে, একবার নয়। অল্প অল্প ভোগ তিনবার ভুগেছি। আচ্ছা সে যাক্। আপনি অতীত ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যৎটা বলুন। ধর্মস্থানে আমার কী যোগ আছে?

ধর্মস্থানে শুভযোগ।

শুভযোগ মানে?

ধর্মে তোমার মতি আছে। ঠাকুর দেবতা পুজো করবে। ব্রত, উপবাস এসব মানবে।

কিন্তু আমি যে মুসলমান।

জ্যোতিষমশাই এর চোখ কপালে উঠল। পরমুহূর্তে তা সামলে নিয়ে বললেন, তুমি আমাকে ঠকাতে এসেছ? তুমি মুসলমান নও।

হাসি চেপে হামিদা বলে, হ্যাঁ ঠাকুর, আমি সত্যি সত্যিই মুসলমান।

জ্যোতিষমশাই রুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি কি জ্যোতিষ শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করতে চাও?

এবারে আমি সবিনয়ে বললাম, তা নয় ঠাকুর! তবে সত্যিই ও মুসলমান।

আশেপাশের সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। জোতিষমশাই হামিদার হাতের উপর ভ্রূকুটিবদ্ধ ললাটে অত্যন্ত ঝুঁকে রেখাগুলো পড়তে লাগলেন। মনে হল তিনি নিজের অভ্রান্ত গণনার ভ্রমের তদন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওঁর মুখ দেখে বোঝা যায় তিনি বেশ ফাঁপরেই পড়েছেন। আজই প্রথম এসব জটিল তর্ক নিয়ে তিনি বিব্রত হয়েছেন বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কাছে জ্যোতিষ শাস্ত্রের রহস্যোদ্ঘাটনে নিষেধাজ্ঞা আছে—এসব কথার অবতারণা করলেন। তাতে অবশ্য তার পূর্বমর্যাদা ফিরে এল না। ভক্তদলের ভক্তি উৎসাহে তখন ভাটা পড়ে গেছে। নিতান্ত হতাশ, জ্যোতিযমশাই শেষে গাত্রোত্থান করলেন বিমর্ষ হয়ে।

তিনি প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে পরম উল্লাসে তাঁর কুৎসা কীর্তন শুরু হল। বেশির ভাগ মানুষই এ রকম। যতক্ষণ যেটাকে সত্য বলে জানবে, ততক্ষণ

সেটা অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকবে ; কিন্তু যে মুহূর্তে সেটা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে, সেই মুহূর্তে তার ওপর নির্মম খড়গহস্ত হয়ে উঠতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। ওদের হাস্য-পরিহাসের মাত্রা এতটাই বেড়ে গেল যে বিরক্ত হয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

একদিন আমরা Son-et Lumiere এর প্রদর্শনী দেখলাম। আলো ও ধ্বনিতে কলকাতার ইতিহাস দেখলাম। একেবারে জোব চানর্ক যেদিন কলকাতায় এসেছিলেন সেদিন থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। বাবু কলকাতার গৌরব। বাংলায় ভাষ্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আর তারই উল্টোদিকে দেখলাম বিঠোফেনের সঙ্গীতের মূর্ছনার তালে তালে আলোর ঝরনা।

এসব দেখতে দেখতে মনে হয় বাড়ি ফেরার কোনও দরকার নেই। সময় যদি এভাবে কেটে যেত কত ভাল হতো। হামিদা বলে, তোমার সঙ্গে কত ভাল ভাল জিনিস দেখলাম। চাও তো আগামীকালও ঘোরা যেতে পারে, কাল আমার ছুটি আছে। ফুটপাতের ওপর দিয়ে হাঁটি হামিদার হাত ধরে। সন্ধ্যার এই ফুরফুরে হাওয়ায় হাঁটতে ভাল লাগে। পাশাপাশি এই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে ওকে বলি, এভাবেই আমার হাত ধরে থাকো হামিদা। ছেড়ো না যেন, ছেড়ো না কোনও দিন।

রাস্তার নিয়ন আলোগুলো জ্বলছে নিভছে। বিজ্ঞাপন বোর্ডগুলোর রং বেরং-এর আলোর ঝলকানিতে কোলকাতা মহানগরীকে মনে হচ্ছে যেন গ্রহান্তরের কোনও অচেনা জনপদ। দিনের শেষে ক্লান্ত কর্মব্যস্ত মানুষের ঘরে ফেরা দেখতে দেখতে আমরাও ফিরে চললাম নিজের নিজের ডেরায়।

এমনি করে আমরা ঘুরলাম বটানিক্যাল গার্ডেন, শহিদ মিনার, দক্ষিণেশ্বর।

ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকা অর্থাৎ কাঁটা পদ্মের বিশালাকার পাতায় স্বচ্ছন্দে একটি শিশু বসে থাকতে পারে। অবাক চোখে এসব আমরা দেখি। আড়াই শো বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি— তোমাকে কে বপন করেছিল তার নাম মনে আছে। ওগো প্রাচীন বট? যক্ষের মতো বসে আছ সেই কবে থেকে। হিসেব করেছ কত জল বয়ে গেছে নদীর বুকে?

জোড়া নারকেল গাছ দেখে অবাক হয় হামিদা।

ওকে বলি, ওগুলো সিসিলি দ্বীপ থেকে আনা ডাবল কোকোনাট।

একটা গোটা দিনে এই বাগান দেখা সম্ভব নয়। গাছগাছালিতে নতুন পাতা। অযত্নলালিত বহু ফুল অযুত পাপড়ি মেলে বসন্তের আবাহনী গাইছে। গোটা শীতকাল প্রকৃতির রুক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখন ফুলে ফুলে হাসছে। কত রকমের যে ক্যাকটাস, অর্কিড আছে তার সংখ্যা নেই।

শহিদ মিনারের মাথায় চড়ে কোলকাতা শহর দেখা হল না।

হামিদা বলে, কারও কি সব স্বপ্ন পূরণ হয় এক জীবনে?

তাই কি হয়? না হবার?

জীবনের পাওয়া খুব ছোট। চাহিদা খুব বড়। তাই জীবনকে মনে হয় খুব ছোট। এক চিলতে ছোট্ট নৌকোর মতো মানুষের জীবন। ঢেউ এর দোলায় টিপ টিপ দুলছে। এই ভেসে উঠছে আবার আড়ালে যাচ্ছে। গঙ্গার হাওয়া এসে উড়িয়ে দেয় হামিদার চুলগুলো।

কী করেছ কাল সারাদিন?

শুয়ে শুয়ে বই পড়েছি।

বাইরে বেরোও নি?

না।

মনে মনে কী আমার কথা ভাবছিলে?

তোমার আবেশে ডুবে ছিলাম সারাদিন।

কী মনে করলে আমাকে?

জানি না?

হামিদা আমার দিকে তাকাও।

হামিদা গঙ্গার জল দেখে।

তাকাও হামিদা আমার দিকে।

বল—কী?

এ চোখে কিছু দেখ না?

না।

সত্যি?

হেসে হামিদা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমাব হাত তার উষ্ণ হাতে তুলে নিয়ে হাতের পিঠে চুম্ খায়।

একটা কথা রাখবে?

কী কথা?

গঙ্গায় কী দেখছ অমন করে? আমায় দেখ।

হামিদা তাকায় আমার চোখে।

তোমার কী মন খারাপ?

না।

কিচ্ছু হয়নি?

না।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পাশে ছোট্ট এক চিলতে জায়গাটা শুধু যে মন্দিরের জন্য ভাল লাগে তাই নয়। গঙ্গার এ পাড়টা সত্যিই রমণীয়। এখানে এসে বসলেই একটা যেন পবিত্র স্পর্শ মেলে। ফুলের বাগানে হাঁটতে হাঁটতে হামিদা বলে, একদিন বেলুড় মঠে যাব।

বিবেকানন্দ ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা মালগাড়ি চলে গেল। একটানা কিছুক্ষণ গুমগুম আওয়াজ উঠল। নীল আকাশের অনেক ওপরে উড়ছে সোনালি ডানার শঙ্খচিল। এই চিল আজকাল দেখতে পাই না। বাঁধানো ঘাটের পাড়ে, দুজনে বসি।

জান। কাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি।

হামিদা নির্বিকার। আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আবার তার চোখ গঙ্গায়। গঙ্গার পাড়ে ভিড় বাড়ছে। বিকেল কেটে এক সময় সন্ধে হয়। উঠে পড়ি।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ায় ঘরে ফিরি। যে যার মতো সবাই ঘরে ফিরছে।

আমার কোনও অফিস নেই, কোথাও যাবার নেই—হস্টেলের ঘরে ফেরা। দিন আসে, দিন যায়—নীরস নিস্তরঙ্গ জীবনের একটাই তরঙ্গ তা শুধু হামিদা।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকি। মেঝেতে একটা চিঠি পড়ে আছে। দাদার চিঠি। কেমন আছো, ভাল আছি'র পর লিখেছে এ মাসে টাকা পাঠাতে পারছে না। বাড়িতে ভীষণ অসুখ বিসুখ চলছে। আমি যেন কষ্টে চালিয়ে নিই। একটু সামলে নিয়েই পাঠাবে।

চিঠি শেষ হয় না। বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। মাথার ওপরে একটা ছাদ আছে। এ ছাদের নিচে কোনও নিরাপত্তা নেই। পকেটে টাকা নেই। মেস চার্জ দিতে হবে। এমনিতেই আমার হস্টেলে থাকাটা ঠিক নয়। তার ওপর খাওয়া খরচ না দিতে পারলে এবার গলা ধাক্কা খাব। এ কোন পরিস্থিতিতে পড়লাম!

পরদিন হামিদার অফিসে ফোন করি। হামিদার ভাল লাগেনি তা ওর গলা শুনেই বুঝতে পারি। আমার কোনও উপায় ছিল না। হামিদা বলে, কী ব্যাপার বলো তো?

এমনি।

ফোন করলে কেন?

তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

আদিখ্যেতা। বলো কী বলতে চাও।

আজ কি আমাদের দেখা হবে?

আজ আমার সময় নেই।

হামি...।

তাহলে মৌলালিতে এস।

না মৌলালিতে নয়, যাদবপুরে। তুমি পাঁচটা পাঁচে এসো লেডিস কম্পার্টমেন্টে।

আচ্ছা! তাহলে পাঁচটা পাঁচে নয়, চারটে দশে যাব। তুমি ডাউন প্ল্যাটফর্মে থেকো।

আচ্ছা!

চারটে দশেই এল হামিদা। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই দুদ্দাড় নেমে এল।

কী ব্যাপার বলো তো?

বলছি। বলে ওকে নিয়ে এক পাশে সরে এলুম। গাড়িটা ছেড়ে দিল। অফিস ফেরতা ভিড় রয়েছে ওতে।

বলো। আগের ঝাঁঝানো সুরেই জিজ্ঞাসা করে হামিদা। আসলে ফোনটা পেয়ে ও উৎকণ্ঠায় পড়েছিল দিনভর।

আমার কিছু টাকার দরকার।

উঃ। হতাশ হয় হামিদা।

এই কথাটা ফোনেই তো বলতে পারতে। সারাদিন আমার কোনও কাজ হল না। হামিদা আক্ষেপ করে।

এদিকটা আমি একদম ভাবিনি। আমি শুধু আমার কথাই ভেবেছি। আমার ভুল হয়েছে বুঝতে পারলাম। মাথা নিচু করে আছি।

হামিদা সচেতন হয়ে উঠল। আশপাশের লোকজন আমাদের লক্ষ্য করছে। ও জিজ্ঞেস করল, কত?

পাঁচশো পেলে আপাতত চলে যাবে।

এই নাও দুশো। কাল দেখা করো মৌলালিতে। বাকিটা দিয়ে দেব। পাঁচটা পাঁচ আসছে, আমি চলে যাচ্ছি।

গাড়ি ঢুকতেই হামিদা লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠে বসল। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই গাড়ি ছেড়ে দিল। হামিদাকে নিয়ে গাড়িটা চলে গেল। প্ল্যাটফর্মে নিত্যযাত্রীদের আনাগোনা। বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমার মুঠোর মধ্যে হামিদার দেওয়া টাকা।

জীবনের কী মূল্য আছে, জীবন যদি যে কোনও সময় ফুরিয়ে যায়। একটা সংসারের স্বপ্ন দেখছি আমরা। একটা বাড়ি হবে। একটা শোবার ঘর, একটা বসার ঘর, একটা লেখাপড়া করার, আর একটা অতিথিদের শোবার ঘর। সংসারের এই স্বপ্ন কি সফল হবে না? তাহলে জীবনের তো কোনও অর্থই নেই।

হামিদা অনুযোগ করেছে।

তুমি কী করছ না করছ, আমাকে জানাবে না? আমি কি তোমার কেউ নই নাকি?

ওর অনুযোগের কোনও উত্তর দিইনি।

হামিদা আরও জিজ্ঞেস করেছে, পৃথাকে তুমি খুব ভালবাসতে না?

ওকে বলেছি, এসব জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তো সব জেনেই আমাকে ভালবেসেছ।

হামিদা অস্বীকার করে না। সে অস্বীকার করতে পারে না। সব জানার পরই ও আমাকে ভালবেসেছে। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসি। যে তীব্র ভালবাসা আমার জীবনে হঠাৎ এসেছে, তা কি ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে?

গরমে হাঁসফাঁস করি। কারেন্ট নেই হস্টেলে। ট্রান্সফর্মার পুড়েছে। ঘরের জানালা দরজা খুলে দিই। ঘরটা বড্ড গরম হয়ে গেছে।

বইমেলায় কেনা ঢাউস বইটা নিয়ে বসি। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। অতীন বন্দ্যোপাধায়ের এই বই আবার পড়তে ইচ্ছে করে। মনে মনে বলি, হামিদার কথা আজ আর ভাবব না।

কিছুক্ষণ বই পড়ার পর তা আর ভাল লাগে না। মনে হয় এরকম ঘরে বসে বসে শুধু সময়ের অপচয় করছি। একটা চাকরি-টাকরি এবার জোগাড় করতেই হবে। বসে বসে খেলে তো রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়।

তা ফুরোক। হাতে যখন টাকা আছে ততক্ষণ কোনও চিন্তা নেই। টাকা ফুরোলে তখন দেখা যাবে। আমি অত গুছিয়ে কাজ করতে পারি না। একজন তো গুছোতে চেয়েছিল, কি হল?

দাদা'র আর কোনও চিঠি আসছে না। কী ব্যাপার, একেবারে ছেঁটে ফেলল নাকি আমায়? একবার ঘুরে আসব নাকি গ্রাম থেকে?

স্নান সেরে নিই সকাল সকাল। ভাল ঘুম হয়নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন দেখি। একজনকে দেখে হামিদার মতো মনে হয়। হামিদা কি এত সকালে অফিস যায়, না ও এখানে আসছে? কিন্তু হামিদা তো এই হস্টেলে কোনও দিন আসেনি। ও এলে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগবে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসি। হু হু করে হাওয়া ঢোকে ঘরে। বিকালে হামিদার সাথে দেখা হবে পার্কে।

ঘড়ি দেখলাম। না ঘড়ি দেখতে ভুল হচ্ছে না। ঠিক পাঁচটা। হাম্মিদা কখনও এত দেরি করে না। ওর সময়জ্ঞান ভাল। তবে কি কাজে আটকে গেছে? নাকি শরীর খারাপ হল? ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠি। এই পরিস্থিতিগুলো অসহনীয় হয়ে ওঠে ভীষণ রকম। আজকাল বেলা অনেকটাই ছোট হয়ে এসেছে।

হালকা কুয়াশার আড়ালে পার্কের গাছপালা, লেকের জল, চলমান মানুষ সব কেমন রোমান্টিক মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ এসেছ?

তোমার এত দেরি হল? শরীর খারাপ হয়নি তো?

না। ঠিকই আছি।

তাহলে দেরি করলে কেন?

সে কথা শুনলে তুমি হাসবে।

তবু শুনি।

আমার সঙ্গে আমার কলিগ মঞ্জু আসতে চাইছিল।

কেন?

কথায় কথায় বলে ফেলেছি ভিক্টোরিয়াতে যাব।

আমার সাথে?

না তা নয়। একা একা যাব শুনে ও আসতে চাইল। বলল, ওর ভিক্টোরিয়া দেখা হয়নি। দেখবে।

তুমি কি বললে?

আজ নয়, আর একদিন দেখাবো বললাম।

ও বিশ্বাস করল যে তুমি একা আসছ?

না। শেষে ওকে বলতে হল।

তাহলে নিয়ে এলেই পারতে।

আসলে তোমাকে বলা হয়নি।

তাকে কী?

না তাতে তোমাকে আপন করে পেতাম না।

তাই বুঝি?

হাম্মিদার কথায় অনাস্বাদিত অনুভবের শিহরন জাগে। মনে হয় আকাশ বুঝি বুকে এসে আমায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। বাতাস আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। ওই দূরে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আমায় অভিনন্দন জানাল।

কিছুক্ষণ কোনও কথা নেই। শুধু দুজনার এগিয়ে চলার মৃদু শব্দ। চলতে চলতে অনুভব করি বুকের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একটা দমকা হাওয়া এসে যেন হৃদয়ের সব অর্গল খুলে দিল। আমার ভিতরের সব উলটে পালটে গেল। আমার বুকের মধ্যে ঝড় ওঠার যে এত জায়গা ছিল, তা আমি নিজেই জানতাম না। পৃথার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল জীবনে ফুলের সমারোহ শেষ হয়ে গিয়েছে। হাম্মিদা আবার আমায় নতুন করে জাগিয়ে দিল।

জলের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছ, কোনও কথা বলছ না ?

ভাবিনি, কথা বলছি।

জলের সাথে?

কেন জান না? জলের কাছেই তো মানুষ তার দুঃখের কথা বলে।

সে তো জানি। কিন্তু দুঃখে তো আমরাই একচেটিয়া অধিকার। তুমি কেন দুঃখের কথা ভাবছ?

ভাবছি আজকের কথা। ভাবছি পৃথার কথা। ওর সঙ্গে তোমার কত প্রভেদ। ও ছিল কালো মেঘের কোণে বিদ্যুতের মতো। তুমি আমার মনের মাধুরী।

তুমি সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারো। আসলে তোমার মনটা খুব রোমান্টিক। রোমান্টিক মানসিকতাই মানুষকে বর্ণময় করে তোলে, কথা বলতে শেখায়, কাব্য সৃষ্টি করে। রোমান্টিক মন ছাড়া কাব্য সৃষ্টি হয় না।

তবে রোমান্টিক মানুষরা জীবনে খুব দুঃখ পায় তা জান? বাস্তব ও কল্পনা প্রায় ক্ষেত্রেই মেলে না।

তা না মিলুক। দুঃখ ছাড়া কি কোনও সৃষ্টি মহৎ হতে পারে? হয়েছে?

তাহলে তুমি বলছ আমি একজন রোমান্টিক মানুষ? তা হলে আমার জীবনেও দুঃখের একটা ভূমিকা থাকবে ভাল?

তুমি যদি এরকম মানে কর, আমি কিছুই বলব না।

ভিতরে ভিতরে খুশি হই। মুখে তা প্রকাশ করি না। বলি, সেই এলেই যখন, তবে দুদিন আগে এলে না কেন?

দুদিন আগে এলে কি বেশি ভালবাসতে?

ভেবে দেখতাম।

হুগলি দ্বিতীয় সেতুর দিকে মুখ করে আমরা বসে আছি। আমাদের চারপাশে আলোকোজ্জ্বল কোলকাতা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। কোলকাতা ক্রমশ মোহময়ী রূপ নিচ্ছে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর দিয়ে গিয়েছ তুমি?

হামিদা সবুজ ঘাস দাঁতে কাটতে কাটতে বলে, না।

কি বিরাট ব্রিজ বলো তো?

ঘাসের একটা ডগা হামিদা গালে বুলোয়। কোনও উত্তর দেয় না।

যাবে নাকি একদিন?

হামিদা আমার বাঁ হাতটি নিয়ে আমার আঙুলগুলো নিজের গালে ছোঁয়ায়। ওর গালে আমার অনামিকার আঙটির স্পর্শ লাগে। বলে, গিয়ে কী লাভ?

এমনি দেখবে। সবাই তো দেখতেই যায়।

দেখার জন্য সেতু। কাজের জন্য নয়।

উঠে বসি। বলি, উলটোপালটা বকো না। বলো ইচ্ছে করছে না।

হাওয়ায় হামিদার চুল ওড়ে। চুলে ওর বুক ঢেকে যায়। মুখ ঢেকে যায়। উঠে হাত খোঁপা বেঁধে বলে, আর একদিন বটানিক্যাল গার্ডেন যাব। বেশ!

এই তো সেদিন ঘুরে এলাম।

তা হোক, আবার যাব। ওখানে কত গাছ আছে বলো তো? গাছেরা কত কথা বলে। ওখানে গেলে শুনতে পাওয়া যায়।

তাই বুঝি? গাছেদের কথা তুমি শুনতে পাও। আর আমি যে কত কথা বলছি, সেগুলো তোমার কানে ঢুকছেই না।

ও সাহেবের বুঝি অভিমান হয়েছে!

নাঃ, চল আজ এবার ফেরা যাক।

ঘরে ফিরতে হবে। আমার ঘর কী তা তো তুমি জান। আমার তাই ফিরতে ইচ্ছে করে না।

তবু যেতে তো হবেই। শোনো, কাল আমি আসব না। একটা জরুরী কাজ আছে। পরশু দিন দেখা হবে। কাল একটু চেষ্টা করে একাই থেকো।

তবু যেতে তো হবেই। কিন্তু কেন যাবো। যত চেষ্টাই করি না কেন, এখন আর আমি একা থাকতে পারব না। আমার শরীরটা হয়তো এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু আমার মন তোমাকে অনুসরণ করে যাবে সব সময়।

গাড়িতে উঠে হামিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তুমি খুব বদলে যাচ্ছ তপন।

কী করে বুঝলে?

আগে আমার হাত ধরতে বেড়াবার সময়। আজ হাতই ধরোনি।

ওর অভিযোগ খণ্ডাবার চেষ্টা করি। বলি, বাগানে যখন বসেছিলাম তখন তো আমার হাত নিয়ে তুমি খেলা করছিলে।

তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ। ক্ষীণ স্বরে বলে হামিদা।

গাড়িতে ভিড়ের মধ্যে প্রকাশ্যে ওর হাতটা তুলে নিই হাতে। হাতের রেখায় তাকিয়ে বলি, দেখি তো তোমার কটা বিয়ের কথা লেখা আছে।

কী হচ্ছে কী? আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় হামিদা।

গাড়ি যাদবপুর এসে গেছে। আমি নেমে পড়ি।

হুস করে গাড়িটা হামিদাকে নিয়ে চলে যায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকি। বুকটা খালি খালি মনে হয়। ট্রেনটাকে শেষ পর্যন্ত দেখি। আজ ভেবেছিলাম—বাড়ির কথা পাড়বো হামিদার কাছে। দাদা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। হস্টেলেও আর থাকা যাবে না। সঞ্জয়ের আর কোনও খবর নেই।

কে যেন বলে, আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে, বাড়ি চলো।

আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। বৃষ্টি নামবে। মনের ভিতরে একটা খুশি নেচে ওঠে। বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে। হু হু করে বাতাস ওঠে। গেয়ে উঠি, হৃদয় আমার আজিকে নাচেরে ময়ূরের মতো নাচেরে। তৃষিত ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে বৃষ্টি। ঢেকে দেয় চোখ। অন্ধের মতো পথ হাতড়াই। একটা ঘোরের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হস্টেলের ঘরে এসে ঢুকি।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে না হলেও আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে ভিজলাম। ভিজলাম মনের আনন্দে টিভি-র বিজ্ঞাপনের মতো। ফলও ফলল পর দিন। গা হাত পায়ে অসম্ভব ব্যথা। মাথা ভীষণ ভারী লাগছে। সারাদিন চুপচাপ পড়ে থাকি বিছানায়। কোনও কিছু ভাল লাগে না।

সন্ধে থেকে তাড়সে এল জ্বর। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। শরীর ভীষণ দুর্বল। বাথরুম করতে গিয়ে পড়ে গেছি। আর কিছু মনে নেই।

থিরথির করে শীতে কাঁপি। পায়ের কাছে চাদরটা গায়ের ওপর টানতে যাই। কোমল একটা হাতের স্পর্শ। জেগে উঠি।

তোমার গায়ে জ্বর। চাদরে ঢেকো না।

চোখের সামনে দেখি হামিদাকে।

ক্ষীণ কণ্ঠে বলি, তুমি এখানে?

হামিদা হাসে। ওর হাতটি আমার কপালে রাখে। জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন বোধ করছি? কি খেতে ইচ্ছে করছে?

বলি, ঠিক আছি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

ও জিজ্ঞেস করে, ডাক্তারের কাছে যাবে আমার সাথে?

না। তার দরকার হবে না।

কিন্তু হামিদা কোনও কথা শোনে না। আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দেন। ওষুধ নিয়ে ঘরে ফিরি।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে একটানা। চারদিক নির্জন কোথায়—এ তো দেখছি ক'দিন ধরে উৎসব চলেছে। পুকুরের জলে বৃষ্টি পড়ে বুজকুড়ি উঠছে পুকুর জুড়ে। ছপছপ শব্দ হচ্ছে অবিরাম। খানা খন্দ সব ভরে গেছে। খানা দিয়ে বাগানের জল খলবল করে ছুটে চলেছে পুকুরের দিকে। রাংচিতের বেড়ার পাতাগুলো হয়ে উঠেছে ঘন সবুজ। মাটির ওপরে ঘাস সবুজ। বাদামগাছের পাতা সবুজ। হস্টেলের এই ঘেরা বাগানের পাতা-ডালপালা বৃষ্টির জলে, পোকা পতঙ্গের শব্দে যেন উৎসবের রাত্রির মতো ঝলমল করছে। কয়েকদিনের মধ্যে গাছগুলো যেন দশহাত বেড়ে উঠেছে। সমস্ত বাগানটা কেমন হাসিখুসি।

এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? চিরপরিচিত গানটা কোথাও বাজছে। আমরা এই গানটাকে কত গভীরভাবে মনে রেখেছি। মনে রেখেছি উত্তম সুচিত্রার ছবিটাকে। আমরা সবাই জানি গানটা হেমন্তর সোনালি কণ্ঠে গাওয়া। কিন্তু ভুল করেও মনে রাখিনি এই গানের রচয়িতা কে? এটাই বোধহয় ট্রাজেডি!

পরের গান শুরু হল—আকাশ আজি মেঘলা। কোথাও বোধহয় রেডিওতে অনুরোধের আসর হচ্ছে। অনুরোধের আসর—একটা সময় কী ভীষণ আকর্ষণ ছিল। বেতার জগতের পাতায় লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে রাখতেন মা শুনবেন বলে। প্রথমে টেপ রেকর্ডার এসে, পরে টিভি এসে মধ্যবিত্ত বাঙালির এই সোনালি দিনগুলোকে শেষ করে দিল।

এই কী ভাবছ?

আমার চিবুক ধরে নিজের দিকে ফেরায় হামিদা।

ওকে বলি, কিছু না।

কিছু তো নিশ্চয়ই। আমাকে বলো।

কী বলব?

তুমি কি আমাকে সত্যি ভালবাসো তপন?

কেন একথা জিজ্ঞেস করছো, নিজে বোঝ না?

না। মাঝে মাঝে তুমি কেমন...

অবাক লাগে না? আমি কে? আত্মীয় বল, বন্ধু বল, কেউ নেই আমার। একটা ভাঙাচোরা জীবন।

তোমার আমি আছি। আমাকে তুমি নাও। আমার যা কিছু সব তোমার।

হো হো করে কেউ কোথাও খুব জোরে হেসে ওঠে। যেন ব্যঙ্গ করতে চায় আমাদের এই সংলাপ। বুকটা কেঁপে ওঠে। আমার ভয় করে। আমি কি পারব? হামিদা আমার ওপর নির্ভর করতে চাইছে। পৃথাও আমার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিল। আমি কোনও ভরসা দিতে পারিনি। তাই ও সজলের দিকে ঝুঁকেছিল। সজল ওকে ভরসা দিয়েছিল। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল ফাঁকিতে ভরা। আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। তাই ওকে কোনও ফাঁপা ভরসা দিইনি। সজলকে বিশ্বাস করে পৃথা ঠকেছে। ওকে যদি একটু ভরসা দিতামই তাহলে কি পৃথা আমায় বিশ্বাস করত? জানি না। এখন আর তা জানার কোনও উপায় নেই।

আজ যদি হামিদাকে না বলি তবে হামিদাও কি মুখ ফিরিয়ে নেবে? পৃথা ছিল এমন এক ধরনের মেয়ে, যুব বয়সের শরীরী প্রচণ্ডতায় খুব সহজেই যে আগুন জ্বালাতে পারত। যার কণ্ঠস্বর শুনলে, যাকে দেখলে ভালবাসা প্রখর হয়, কাছে পেতে ইচ্ছে করে—কখনও মনে হয় দুই বাহুর নিষ্পেষণে ওকে প্রবলভাবে পিষে ফেলি সেইরকম। আবার কখনও খুব মন খারাপের মুহূর্তে, নৈঃশব্দের মধ্যে ওকে একান্তভাবে পেতে ইচ্ছে করত। ওর দীর্ঘ চুম্বনের কল্পনায় অনেক রাতে আমি বিছানায় জেগে উঠে বসি।

বাথরুমে অস্পষ্ট দেওয়াল আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করি। অস্পষ্ট আয়নায় আমাকে কেমন একটা বয়স্ক মানুষ বলে মনে হয়। পৃথাকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এত ব্যস্ত ছিল যে ওর মনের গভীরের খবর আর নিতে পারিনি। একতরফা কোনও কিছুই তো হয় না। তাই ওর প্রতি আমার ভালবাসা আগেই ঝরে গেল। নদী যেন মরুপথে হারাল ধারা। কিন্তু ভালবাসার ইচ্ছে তো কখনও মরে না, সুপ্ত হয়ে থাকে মাত্র। তাই সে ইচ্ছেটা আজ অনুকূল বাতাস পেয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে মুক্ত আকাশে। হামিদার ভালবাসার আকাশে আজ আমি যেন মুক্ত এক বিহঙ্গ।

মনে হল, আজকের দিনটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। এমন কী বিকেলের সূর্য ডুবে যাওয়ার দৃশ্যটার থেকেও তাড়াতাড়ি। এরকম দিনের বিষণ্ণ সন্ধেটা কিছুতেই কাটতে চায় না।

রেডিওতে গান ভেসে আসে—আপনাকে জানা আমার ফুরাবে না।

গানের কথাগুলো ধ্রুব বলে মনে হল। সত্যিই প্রতিদিন মানুষ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। ঘুম থেকে উঠে রেডিয়োর খবর শুনি। রেডিও শুনতে শুনতে কফি তৈরি করি হিটারে। হামিদাব এনে দেওয়া বিস্কুট বা কেক খাই কফির সঙ্গে। হস্টেলের ঘরে এখন সব কিছু গোছানো। প্রতিদিন এসে হামিদা এই কাজটা করে। ঘর ঝাড়ু দেয়। জানালার কাচ মুছে দেয়। জামা-কাপড় ধুয়ে দেয়।

পুরো দিন যায় আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, হামিদার আসতে আর ক'ঘণ্টা ক'মিনিট ক'সেকেন্ড বাকি আছে, তা হিসেব করতে করতে। ও ঘরে ঢুকলে আমার দুর্বল শরীরেও উচ্ছ্বাস আটকে রাখতে পারি না।

হামিদা তার নতুন পরিকল্পনার কথা বলে। বলে, একটা কম্পিউটার কিনবে। আমাকে ডিটিপি শেখাবে। আমি ঘরে ডিটিপি-র কাজ করব। ও যে প্রতিষ্ঠানে আছে সেখানে কাজ করার সুবাদে ওর পরিচিতির যে সুযোগ হয়েছে তাতে অনেক কাজ পাওয়া যাবে। ভাল ডিটিপি অপারেটরের বাজার আছে। সুতরাং আমাকে আর হস্টেলে থাকতে হবে না। শিগগিরই আমরা ঘর বাঁধবো।

হামিদা বলে, বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবা শুক্রবার বাড়ি আসছে। শনিবারও ছুটি। শনিবার সারাদিন ওদের বাড়ি থাকার নেমন্তন্ন। হামিদা আসলে আমাকে দেখাতে চায় ওর বাবাকে।

বলে, তোমার কথা সব বলেছি বাবাকে। বাবা মেনে নিয়েছেন। আমি কোনও কিছু লুকোইনি বাবার কাছ। জানো, বাবা আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু। বাবা আমাকে ভীষণ ভালবাসে। ভালবাসে বলেই আমি যা করতে পছন্দ করছি, তাতে বাবা বাধা দেয় না।

যেমন পাত্রী দেখতে যায় লোকে আমার সেরকম বোধ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমিও তো কনে। যাদবপুর থেকে বহড়ু কত আর দূর। হামিদার সঙ্গে সম্পর্কটা দানা বাঁধতে চলেছে। হামিদা ভীষণ সিরিয়াস। নইলে, ওর বাবার কাছে আমায় নিয়ে যেত না। হামিদা আমার স্ত্রী হবে, লক্ষ্মী বউয়ের মতো সে স্বামীর সেবা করবে, আবার চাকরিও করবে। স্বামীকে সুখী করার জন্য এমন কিছু নেই যে সে করবে না। মনে ছোটার গতিতে ট্রেন ছুটতে পারে না। বুক ভরে শ্বাস নিই। একসময় বহড়ু স্টেশন এসে যায়।

স্টেশনে হামিদার বাবা দাঁড়িয়েছিলেন। পরিচয় ছিল না, অনুমানে বুঝলাম ইনিই হামিদার পিতা। ছোটখাট ভারী শরীরের হাসিখুশি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের আধিকারিক। চাকরি জীবনে অবসর এগিয়ে এসেছে। একমাত্র মেয়ে হামিদা। স্ত্রী গত হয়েছেন তা বছর পনেরো হবে। ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, শুধরে নমস্কার করলাম। হামিদা ওর মায়ের ছবি নিয়ে এল। ওর ছোট বেলার ছবিও দেখলাম। ওর একটা দাদা ছিল। সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত। কারগিল যুদ্ধের সময় মারা গেছে। মিলিটারি ড্রেস পরা ওর দাদার ছবি দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। তাতে শুকনো মালা দুলছে। পাশে ওর মায়ের ছবি। এখানে ওদের কোনও আত্মীয় নেই। সব বাংলাদেশে। বিয়ে-সাদীতে দেখা হয়, আসে কেউ কেউ। এরপর যে যার জীবনে চলে যায়। হামিদা এ বাড়িতে এসেছে আড়াই বছর বয়সে। হামিদা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তেরো বছর বয়সে। লেখাপড়া করেছে বালিগঞ্জের মুরলীধর গার্লসে। তারপর ডিটিপি শিখে এখন চাকরি করছে।

মোতি সাহেবের পোস্টিং এখন রানিগঞ্জে। সম্ভবত ওখান থেকেই অবসর নেবেন। চাকরি আর বছর দেড়েক আছে। রানিগঞ্জ থেকে বহড়ু খুব বেশি সময়ের পথ নয়, তবু ছুটিছাটাতে আসা হয় না। জীবন যার যার তার তার। কারও ইচ্ছে নেই অতীত নিয়ে পড়ে থাকার। সে অতীত যদি ব্যথারও হয়।

হামিদা এবং হামিদার বাবা মোতি সাহেবের জীবন এরকমই। এমন নয় যে মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে দায়িত্ব পালন শেষ। কোনও সুখবর যদি থাকে, দূর থেকে একবার ফোনে বা চিঠিতে জানিয়ে দিলেই হল। আজকাল ফোন হয়ে সুবিধে হয়েছে। চিঠি লেখার পাট গেছে উঠে। চিঠিতে খরচ আছে, কবে পৌঁছবে তাও অনিশ্চিত। আর ফোন লাগাও কথা বল একেবারে মুখে মুখে।

হামিদার প্রেম ওর বাবার জন্য সুখবর। হামিদা নিজে সুখবরটি বয়ে এনেছে। আমি দেখতে সুদর্শন কি না, আমি মুসলমান না অন্য জাতের, উনি তার বিচার করছেন না। আমি যেরকমই হোই না কেন, ওঁর মেয়ে আমাকে নিয়ে সুখী হবে, সেটিই বড় কথা। আমি যদি মানুষ না হয়ে ভূত হতাম আর হামিদা ওর বাবাকে বলতো একে আমি ভালবাসি, একে আমি বিয়ে করতে চাই। ওর বাবা তাহলেও হয়তো আপত্তি করতেন না। সাধারণ বাঙালি অভিভাবকদের মধ্যে এরকম আমি দেখিনি।

ছোটবেলায় হামিদা যা সব কীর্তিকাণ্ড করেছে, উনি সোৎসাহে তার বর্ণনা করছিলেন। গল্পে গল্পে যা হয় আমার উঠতে ইচ্ছে করে না। শেষ ট্রেনটাও শিয়ালদহের দিকে চলে যায়। রাতটা আমায় থেকে যেতে হয় ওদের বাড়িতেই। এই দিনটা আমার জীবনে এক রঙিন দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

অদ্ভুত মানুষ মোতি সাহেব। এত উদার ও প্রশস্ত মনের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বিপদ আপদের দিনে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যেন তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম। সরকারের উঁচু পদে চাকরি করছেন কিন্তু তার জন্য কোনও অহমিকা নেই। এমন একটা মানুষের সাথে পরিচয় হওয়ার পর তাঁকে শ্রদ্ধা না-করে পারা যায় না।

পরদিন দুপুরের খাওয়ার পর হামিদা ছাড়ল। ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি ওদের বাড়ির দিকে। ট্রেন চলতে শুরু করে। হামিদা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে। ট্রেনটা আমাকে নিয়ে ক্রমশ দূরে সরে যায়।

সামনে আসে দিগন্ত বিস্তৃত ধানের খেত, লেবু অথবা আম অথবা লিচু অথবা পেঁপে অথবা করমচার বাগান। হঠাৎ হঠাৎ সাঁ-সাঁ ছুটে যাচ্ছে। রেলের কামরায় বসে আমার অতীত জীবনের ঘটনাগুলো সিনেমার ছবির মতো ভেসে ওঠে। উদাসীন ভাবনায় ছবিগুলো সামনে এসেই ঝপ্ করে পিছনে চলে যাচ্ছে। আমি এক অনাগত দারুণ ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছি।

সেদিন রাতে জ্বর এল আবার। সারারাত জ্বরে কাঁপি। সকালের দিকে জ্বর ছাড়লে মরার মতো ঘুমোই। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠি। বিকালে হস্টেলের একটি ছেলে আমার চিঠি দিয়ে যায়। খামটা খুলি। দাদার চিঠি।

আমার জন্য আর টাকা পাঠানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে যখন আমার আর কোলকাতায় থাকার দরকার নেই। দেশে ফিরে গিয়ে বাবার রেখে যাওয়া যেটুকু জমি আছে, চাষবাস করলে আমাদের চলে যাবে। দাদা উপদেশ দিয়েছে।

সাতদিন পর জ্বর সেরে যায়।

প্রবাদটার কথা মনে পড়ে। সর্দি জ্বর, ওষুধ খেলে সাত দিন, নইলে এক সপ্তাহ।

নতুন উদ্যমে জেগে উঠি। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে পড়া হয়ে গিয়েছে। এবারে পড়ব অলৌকিক জলযান। হামিদাকে বলব বইটা কিনে দিতে। অর্ধেক দিন ধরে গোছগাছ করে, স্নান করে সেজেগুজে হামিদার অপেক্ষায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চোখের মণি আর মন আটকে যায় যখন, হস্টেলে হামিদার ফোন আসে—আজ, আসতে পারছে না। কাজের থেকে ফিরতে দেরি হবে। তাই সোজা বাড়ি চলে যাবে।

কিন্তু আমি যে বসে আছি?

লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না। কাল একটু বেশি সময় থাকব।

একা একা ঘর আর বারান্দা করি। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ছবির অ্যালবামটা তুলে নিই হাতে। ওদের বাড়িতে তোলা ছবিতে হামিদা হাসছে। ছবিগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি। পাতলা গোলাপি ঠোঁট, টিকোলো নাক, বসা গালের, বাদামী চোখের সুন্দরী হামিদাকে না-ভালবাসার কোনও কারণ থাকতে পারে না। ভালবাসা কখন যে আচমকা আমাকে এমন গ্রাস করে নিল জানতে পারিনি। যখন হাঁটি, চলি, কারও সঙ্গে কথা বলি, একা বসে থাকি, যখন ঘুমোই, যখন জেগে উঠি, আমি স্পষ্ট টের পাই যে কাউকে আমি ভালবাসি।

হামিদা আজ আসবে না। অথচ আজ হামিদাকে আমার অনেক কিছু বলার ছিল। আমাকে বলতে হবেই। প্রথমে ভাবলাম থাক কাল তো ওর সাথে দেখা হচ্ছেই। অথচ বিকেলের কী এক অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণে মৌলালিতে গিয়ে হাজির হলাম। মনে হল এই বুঝি হামিদা এসে দাঁড়াবে। ওর স্পর্শ অনুভব করতেই যেন এলাম। মনে মনে ভাবি, হামিদা আমাকে এতখানি প্রভাবিত করেছে? মৌলালির এই রাস্তা, গাড়ির চলাচল, জোড়াগীর্জার ওই চূড়ো, মসজিদের ওই আজানের ধ্বনি সবই হামিদা ময়। এখানে এসে আমি ওর সান্নিধ্যের সুগন্ধ পাচ্ছি। ওর স্পর্শ অনুভব করছি।

প্রথমে যুবকেন্দ্রটার এধার ওধার একবার হেঁটে এলাম। তারপর ক্যান্টিনে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। ক্যান্টিনে আজ বেশ ভিড়। যুবকেন্দ্রের হলে কি একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। বসে বসে মানুষজন দেখি, দেখি রাস্তার গাড়ি চলা। একটা গান কোথা থেকে ভেসে এল—রবীন্দ্রসঙ্গীত। কোথাও মাইক বাজছে। কলকাতায় সিক্সটি ডেসিবেলের ঝামেলা, তাকিয়ে দেখি মাইক বাজাচ্ছে খোদ কোলকাতা পুলিশ। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে।

আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।

ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথের গান অথচ মনে হয় গানটা যেন আমার নিজের জন্যই বাজছে।

হামিদা বলে, বেশি ঘুমিও না। বেশি ঘুমোলে শরীর ভারী হয়ে যায়। আলস্য ঘিরে ধরে শরীরকে।

পরপর কয়েকদিন ছুটি নিল হামিদা। অসুখ বিসুখ নয়, কাজের জন্যই তার এই ছুটি নেওয়া। অন্য কোথাও নয়, কোলকাতার অফিস পাড়াতেই আমায় নিয়ে ঘুরল হামিদা। কোনও দিন দুটো তিনটে অফিস, কোনও দিন চার-পাঁচটা। এইভাবে দুজনে

ছুটোছুটি করলাম। কখনও সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে ওঠা, কখনও লিফ্‌টে ঠাসাঠাসি করে গন্তব্যে পৌঁছনো। জিজ্ঞাসু চোখের চাউনি, কৌতূহলী মন্তব্য, নানা প্রশ্ন, আশ্বাস আর ফিরিয়ে দেওয়া, এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হল দিনগুলো। ঘুরতে ঘুরতে গোটা অফিস পাড়াটাই মুখস্থ হয়ে গেল আমার।

সেই সঙ্গে চলল ডিটিপি শিক্ষা। কম্পিউটার যে এত আকর্ষণীয় যন্ত্র আগে জানা ছিল না। এক একটা বোতাম টিপি আর খুলে যায় এক একটা অজানা রোমাঞ্চভরা জগৎ। আগে এর কিছুই জানতাম না। ক্রমে সব শিখতে লাগলাম।

ডিটিপি শেখার একদিন বিরতি দিলাম, হামিদাকে বললাম একদিন ছুটি চাই। সঞ্জয়দের বাড়ি যাব। ওর অনুমতি নিয়ে সকাল সকাল চলে এলাম জয়নগর। সঞ্জয় ছিল বাড়িতেই। আমাকে দেখে চমকে উঠল।

কোত্থেকে?

ওকে পাশ কাটিয়ে ওদের বাড়ি ঢুকি।

তারপর কী ব্যাপার? সঞ্জয় তার চমকানো চোখ নিয়ে জানতে চায়।

কিছু না। কেমন আছিস সবাই খবর নিতে এলাম। থাকার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি। টের পাই ও হয়তো ভাবছে ওদের বাড়ি থাকতে এসেছি।

তুই নাকি একটা মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করছিস?

মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। শোভনাকে দেখতে পেয়ে খাবার জল চাই।

কী হয়েছে কী তোর?

কিছু হয়নি তো।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিই। সঞ্জয় থেকে যাওয়ার কথা বলে না। চা খাওয়ার কথা বলে না কেউ। অথচ এ বাড়িতে কত স্নেহ পেয়েছি, পেয়েছি কত ভালবাসা। কতদিন পরে এলাম, সঞ্জয় তবু বসতে বলল না।

বাংলাদেশে আর মেয়ে ছিল না?

আবার সেই এক কথা।

অবশ্য মুসলমান মেয়েদের সেক্স খুব বেশি হয়।

কী বললি তুই?

সঞ্জয় খিল খিল করে হেসে উঠল। চোখ মটকে বলল, ভেরি ভেরি সেক্সি।

তার মানে? আমার আপাদমস্তক রি-রি করে উঠল। মনে হল এক চড়ে ওর মুখখানা ঘুরিয়ে দিই।

তুই কি এখানে থাকতে এসেছিস?

না, এখানে থাকার জন্য আসিনি। এসেছিলাম নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু তোর যা মতিগতি দেখছি...।

সঞ্জয়ের বিষাদ আমাকে কামড়ায়। ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ি।

কোথায় যাচ্ছ তপন?

মাসিমার গলা। ঘুরে দাঁড়াই। মাসিমা কোথায় দেখতে পাই না।

মাসিমা কেমন আছেন? ভাল?

আমার আর থাকা।

কোথায় যাব? শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মাসিমা ডেকে নেন ওপরে। বসতে বলেন। চা খাবার কথা বলেন। চা নিয়ে এল শোভনা।

তুমি নাকি বিয়ে করছ?

আবার সেই একই প্রসঙ্গ।

হ্যাঁ। আমি একজন মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করছি।

তুমি মুসলমান হবে?

না।

মেয়েটি হিন্দু হবে?

না।

তাহলে তোমাদের বিয়ে হবে কী করে?

কাগজে সই করে।

পরিচয় হল কোথায়?

ট্রেনে।

ট্রেনে পরিচয় আর বন্ধু হয়ে গেল? এত তাড়াতাড়ি?

সঞ্জয় হেসে ওঠে। ও একটু দূরে বসে আমাদের কথা শুনছে। ওর হাসি আমার গায়ে জ্বালা ধরায়।

বন্ধু হওয়া এত সহজ তপন? শোভনা খুব আস্তে আস্তে বলে। ওর বুক থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস বের হল। সাত বছর এক সঙ্গে ঘর করছি, বন্ধুত্বই হল না।

আবার একদিনেও হয়! হয় না? শোভনার মুখের দিকে তাকাই।

শোভনা হাসে। এ হাসি সম্মতির।

আমার মনে হল, এ বাড়ির কেউ মুসলমানদের ছুঁয়ে ফেললে জামাকাপড় সব ছেড়ে স্নান করে শুদ্ধ হয়। আজ আমি মুসলমান মেয়ে বিয়ে করছি জেনে বোধহয় এত প্রশ্ন করছে আমায়।

সঞ্জয় আমাদের কাছ থেকে উঠে যায়। শোভনা বলে, ওসব বাদ দাও, সময়ে বুঝতে পারবে। জীবন এত সহজ নয়।

তুমি আমার একটা উপকার করবে?

আমি? শোভনা আর্তনাদ করে ওঠে। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। আমার কোনও উপকারে লাগতে পারে, এ ধারণাই ও করতে পারে না। আমার কাছে সরে আসে। খুব বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ের মতো বলে, সত্যি বলছ তপন?

হ্যাঁ।

কী উপকার তেমার আমি করতে পারি?

এক নম্বর আমার বিয়ের সাক্ষী হতে হবে। দু নম্বর আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হবে। বেশি নয়, হাজার পাঁচেক হলেই চলবে। তবে এক্ষুণি লাগছে না। বিয়ের দিন দিলেও চলবে।

শোভনা বুঝে পায় না মাত্র এই কটা টাকায় আমি কী করব? বলে, তুমি কী করে বুঝলে আমি তোমায় টাকা দিতে পারি? তোমার বন্ধুকে চাও?

জানি তোমার কাছেই পাব।

আমার ওপর তোমার এত জোর?

হ্যাঁ।

আমাকে তুমি কী ভাব?

শান্ত স্বরে বলি, বন্ধু!

তাহলে কী করে আশা কর যে আমার কাছেই টাকা পাবে? এতটা জোর আমার উপরে কী করে তুমি পাও, সঞ্জয়কে বাদ দিয়ে?

আমার মন বলে তোমার কাছেই পাব।

ছিঃ। আমার নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে।

কী বলছ এসব?

ভেবেছ, ভালবাসার দুটো কথা বলে আমায় পটিয়ে নেওয়া খুব সহজ?

তুমি কী বোকা বলো তো? শুধু মুখের 'ভালবাসা' শব্দটাই শুনতে এত কাঙাল? মনের কথা বুঝতে পার না। আচ্ছা তোমার বয়স কত? কুড়ি পার হয়নি নিশ্চয়।

সাতাশ।

সাতাশ? দেখে তো এখনও উনিশ মতো লাগে।

তোমার কত?

পঁচিশ।

পঁচিশ? শোভনা অবাক হয়।

কেন দেখে কি বেশি মনে নয়? কত ভেবেছিলে?

তিরিশ কি বত্রিশ।

হো হো করে হেসে ফেলি। রীতিমতো বুড়ো করে দিয়েছো আমায়।

তুমি কি চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ চলে যাচ্ছি।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। থেকে যাও এখানে।

থেকে যাব? বসতেই বললে না, শুতে দেবে কোথায়?

শোভনা ফিসফিস করে বলে, ভয় হয়!

আমি আর দাঁড়াই না। উঠে পড়ি। দাঁড়িয়ে বলি, জানো, সেদিন তোমার পা দেখে চমকে গিয়েছিলাম।

আমার পা?

কথাটা শুনে শোভনা প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, তোমার পা। তোমার শাড়ির পাড়টা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা খোঁচায় আটকে যেতেই আমি ধরে ফেলেছিলাম। নইলে শাড়িটা সেদিন ছিঁড়ে যেত।

শোভনা বলে, কিন্তু পা কখন দেখলে তুমি?

তখনই তো। তোমার শাড়িটা আটকে যেতেই খানিকটা পা বেরিয়ে পড়েছিল, নজরে পড়ল তোমার আলতা-পরা একটা পায়ের পাতা আর গোল পায়ের গোছ। সেদিন এত ভাল লেগেছিল যে...।

শোভনা বলে, ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। অমন করে বোলো না।

বাঃ ভালকে ভাল বলব না। অবশ্য বলতাম না, কিন্তু তখন তো জানতাম না তুমি কে, তোমার আসল পরিচয় কী!

সে আমার কপালের দোষ।

কপালের দোষ বলছো কেন?

কপালের দোষ নয়? কপালের দোষ না থাকলে বিয়ের সময় কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে? কপালের দোষ না-থাকলে কারও নির্দিষ্ট বরের সঙ্গে বিয়ে হয় না? কপালের দোষ না থাকলে...

থাক আর কপালের দোষ দিতে হবে না। আমি অত কপাল টপাল মানি না।

তা মানবে কেন? তোমাকে তো আর ভুগতে হয়নি আমার মতো! আমার মতো কষ্ট পেলে তুমিও কপাল মানতে।

কিন্তু মনে কষ্ট পুষে রেখে মুখে হাসি ফোটানো যে কত শক্ত তা তো তুমি মানো!

সত্যি? কষ্ট হয়? সত্যি বলো না? তোমারও কষ্ট হয় তাহলে আমার মতো?

সাহসে ভর করে শোভনা আমার কাছে ঘেঁষে এসেছিল। এবার যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। বলল, না বাবা, তুমি একটু সরে বোস। আমার ভয় করে। অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

বাড়ির ইটগুলোরও যে এক একটা কান আছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা অলিন্দে, প্রত্যেকটা কোটরে, প্রত্যেকটা প্রকোষ্ঠে, প্রত্যেকটা গবাক্ষে শোভনার কথাগুলো হাহাকার হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সঞ্জয় আসছিল দৌড়ে। বাড়ির মধ্যে আমাকে দেখে আবার অবাক হল।

ওঃ তুই এখনও আছিস?

সঞ্জয়ের ঠোঁটে আলগা হাসি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোনও প্রশ্ন খুঁজে পেলাম না। আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবি?

সঞ্জয়কে চিন্তিত দেখাল। বললো, কী ব্যাপার বল তো?

কিসের কী ব্যাপার?

না। এমনি।

সঞ্জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ঈর্ষা ও রাগে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বললাম, তাহলে যা ভাল বুঝিস করিস।

সঞ্জয় একটু চুপ করে থাকল, কী ভাবল যেন। তারপর বলল, তুই কি এটা ঠিক করছিস?

ওর কথাগুলো আমার কাছে তেমন জরুরি মনে হল না। নিজেকে আবার একবার সামলে নিয়ে বললাম, আমার আসার কারণ আমি জানিয়ে দিয়েছি। এবার যা করবি তা তোদের বিবেচনা। যাক্ চলি।

একটু দাঁড়া। সঞ্জয় বলল, আমিও বেরুব, কথা আছে।

সঞ্জয় তৈরি হচ্ছিল। আমি ওর ঘর, ঘরের দীন আসবাব, বিবর্ণ দেওয়াল লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখতে দেখতেই শিথিল হয়ে এল আমার হাত-পা। যদি এমন

হতো হামিদা এসময় এ ঘরে এসে বসতো আমার কাছে। ওকি থাকতে পারবে এরকম একটা বাড়িতে বা ঘরে! মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল ওদের বহডুর বাড়িটা। সেখানে হামিদার জন্য আলাদা ঘর, আলাদা বাথরুম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ওই বাথরুমের আয়তনই তো সঞ্জয়ের এই ঘরের চেয়ে কম নয়। নাঃ হামিদাকে এখানে কল্পনাই করা যায় না।

সঞ্জয় বলল, চল। বাইরে একটু ঘুরে আসি।

সঞ্জয়ই আগে বেরুল। পিছন থেকে আমি ওকে অনুসরণ করলাম। দুঃখী মানুষদের একরকম চেহারা হয়। ভিতর ফাঁপা গাছের মতো। যেন একটু ঠেলা দিলেই পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত এটা আমার কল্পনা, আমি জানি এই মুহূর্তে সঞ্জয়ের চেয়ে সুখী আর কেউই নেই এ বাড়িতে।

এই প্রথম আমার মনে হল বন্ধু হলেও ও আমাকে বঞ্চিত করেছে। ও প্রথমে যদি পাত্তা দিত পৃথার প্রতি আমার আকর্ষণকে তাহলে হয়তো আজকের এই পরিস্থিতি তৈরিই হতো না।

খোকনদার মিষ্টির দোকানে মুখোমুখি আমরা বসলাম। মোয়া তৈরি হচ্ছে। আশ্বিনের খই আর নলেন গুড়ের গন্ধ ভেসে আসছে। বড় বড় মৌমাছি দোকানময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঞ্জয় চা বলল, ওর চোখে একটা সরল হাসি ফুটল। আমি ঈর্ষা বোধ করলাম। ওই হাসির উৎস আমার জানা আছে। সঞ্জয় হয়তো আমার আর পৃথার আগের সম্পর্ক স্মরণ করে এখনও করুণা করছে আমাকে। ওর চোখে চোখ রাখতেও অস্বস্তি হচ্ছিল আমার।

দোকানের ছেলেটা চা দিয়ে যাবার পর সঞ্জয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবি?

আমি বললাম, না।

খেতে পারিস। সঞ্জয় বলল, এখন মাসের শুরু। খুব একটা গরিব অবস্থায় নেই আমি।

জানি তোর এখন পয়সা হয়েছে।

তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন?

তুই কী ভেবেছিস? আমি কিছু বুঝি না?

চিৎকার করে উঠলাম আমি। একদম অসহ্য লাগছে। সঞ্জয় যেন আমার দৈন্যকেই সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। ওর সামনে নিজেকে কেমন খেলো বলে মনে হল আমার।

থাক্! আমার ফেরার তাড়া আছে। আমি বললাম।

কথা এগোচ্ছিল না। খানিক চুপচাপ বসে থাকার পর সঞ্জয় বলল, এত তাড়া? কই আগে তো দেখিনি।

আত্মরক্ষার চেষ্টায় উল্টোগলায় বললাম, দেখবি কী করে, সেদিকে তোর মন ছিল কি?

সঞ্জয়ের এইসব কথাগুলো আমার বিশেষ অচেনা লাগল না। যা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

কিছু বলতে হবে বলেই বললাম, তুই কী বলতে চাস?

সঞ্জয় ঝুঁকে এল। একটু চুপ করে থেকে বলল, এই বিয়েটা না করলেই ভালো করতিস না কি? আমার সন্দেহ হয়, শেষ পর্যন্ত তোরা সুখী হবি কি না।

অবান্তর ভেবে জবাব দিলাম না।

সঞ্জয় বলল, আমাকে ভুল বুঝিস না।

চলাফেরার রাস্তায় অনুভব করলাম, বুকের ভেতর ঘন ও ভারী হয়ে উঠছে নিঃশ্বাস। মনে হল, পৃথার সঙ্গে যে একটা রাত কাটিয়েছিলাম ডায়মন্ডহারবারের এক হোটেলে, সে খবরটা সঞ্জয় জানে না।

ওটা কে রে! হলধর খ্যাপা না?

সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলাম।

সঞ্জয় ঘাড় নাড়ল।

আনমনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম দুজনে। এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে এল। খেয়ালই ছিল না কোথায় চলেছি। কোথায় এসে পৌঁছিয়েছি। এ তো নীমপীঠ। এখানে পৃথার সঙ্গে কতদিন এসেছি।

মাথার মধ্যে সমস্ত অতীতটা তোলপাড় করতে লাগল। সড়কটা উঁচু নিচু। কতবার যে হোঁচট খেয়েছি তার ঠিক নেই। পৃথা কেবলই বলতো আপনি অমন হাঁ করে হাঁটেন কেন? রাস্তার দিকে নজর দিয়ে চলতে পারেন না? পড়ে যাবেন যে—

আশেপাশের লোকগুলো আমাকে চিনতে পারছে কি না কে জানে? চিনতে পারলে হয়তো বলছে—এই দেখ সেই ছোঁড়াটা পৃথার সঙ্গে ঘুরতো। কিন্তু এখানে হলধর কী করছে?

দেখি একটা চায়ের দোকানে চা খেতে চাইছে। নোংরা ঢ্যাঙা মতো একটা খ্যাপা লোক। পৃথা চিনিয়ে ছিল—এ হচ্ছে হলধর খ্যাপা, বিয়ে পাগলা বুড়ো। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বিয়ে করতে গিয়েছিল, বিয়ের পিঁড়িতে কনে ওকে দেখে নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। দিয়ে আর বিয়ে হয়নি তার সাথে। সেই থেকে বিয়ে না-হওয়ার দুঃখে খ্যাপা হয়ে গিয়েছে। বাড়িও যায় আবার এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কোনও বিকার নেই, কোনও দুঃখ নেই। কেবল ঘোরে। পায়ে হেঁটেই যেন সারা পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করতে চায়।

ছেলেরা খ্যাপালে বলে, আমি মানুষ নই গো, আমি মানুষ নই ভূত। দেখছ না আমার পা দুটো কেমন লম্বা ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা। সেই জন্যই তো আমার বউ আমায় দেখে ভয় পেয়ে ফিট হয়ে গিয়েছিল।

তারপর একটু থেমে কী মনে করে বলে, তোমরা হাসছো, কিন্তু হাসি নয়, খাঁটি কথা বলছি আমি। বেঁচে গিয়েছি আমি। সে মেয়ের সঙ্গে বনবে কেন আমার? সে মেয়ে যে খুব সুন্দরী। বাউন্ডুলে খ্যাপা মানুষ আমি, আমার সঙ্গে বনবে কেন তার?

হলধরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার বউ কেমন সুন্দরী ছিল গো?

হলধর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, আজ্ঞে আপনার সঙ্গে তার খুব মানাতো। তার—

পৃথা খুব জোরে হেসে উঠেছিল হো-হো করে। বলেছিল, দূর বুড়ো!

আজ্ঞে না দিদিমণি। আমি ঠিক বলছি। এই বাবুর সঙ্গে খুব মানাতো। এই বাবু তো দেখতে সুন্দর, আমার বউও দেখতে সুন্দর। দুজনে সংসার আলো করে থাকত।

কী ভেবে হলধর সেদিন এসব কথা বলেছিল কে জানে? হয়তো রসিকতা করেছিল, কিংবা হয়তো সিরিয়াসলিই বলেছিল। কিন্তু হলধরের কথাটা ভুলতে পারিনি।

শোভনাকে শুনিয়েছিলাম। ও কোনও উত্তর দেয়নি। ওকে বলেছিলাম, তুমি হয়তো বিশ্বাস করছো না। হলধর সত্যিই বলেছিল, পৃথা সাক্ষী আছে।

শোভনা বলেছিল, এসব কথা থাক।

আমি আর পীড়াপীড়ি করিনি। ওর কথা সত্যি হলেও কি তোমার খুব ভাল হতো?

ছিঃ, তোমার মুখে দেখছি কোনও কথাই আটকায় না।

আমি যে কিছুতেই এসব কথা ভুলতে পারি না।

ভুলতে চেষ্টা তো করবে। আমি তো ভুলে গেছি।

তোমার মতো মন হলে হয়তো ভুলতে পারতাম। কিন্তু আমার মনের গড়নটাই যে অন্যরকম। তোমার সঙ্গে মেলে না।

মিললে কী হতো?

মিললে হয়তো সেদিন বিয়ের পিঁড়িতে তুমিই বসতে চাইতে ওই অবস্থায়।

তাতে তোমার কী লাভ হতো?

আমাকে এখানে এসে কাকিমা সাজতে হতো না।

তুমি সঞ্জয়ের কাকিমাই হও আর যেই হও। আমার কাছে তুমি কিন্তু সেই শোভনাই রয়ে গেছ।

শোভনা ভয়ে ভয়ে চারদিকে চেয়ে বলেছিল, অত চেঁচিও না। শেষকালে কেউ শুনে ফেললে আমার বিপদ বাড়বে।

যাদবপুরে পড়তে আসা। সঞ্জয়ের সঙ্গে পরিচয়। আবার ওদের বাড়ি না এলে হয়তো এমন হতো না। শোভনা আমাদের গ্রামের মেয়ে। ওর বিয়ের নিমন্ত্রণ ছিল আমাদের। আমি সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। গোলমাল দেখে চলে আসি।

এখানে এসে যখন হলধরকে দেখলাম। সব কিছু জানলাম। ওকে বলেছিলাম, তাই কখনও হয়? তোমাকে দেখে সে মেয়ে ফিট হবে কেন! তার ছিল ফিটের ব্যামো। সারা দিন উপোস করে নেতিয়ে পড়েছিল।

এসব শুনে শোভনা বলেছিল, ওর জন্যে তোমার দেখছি খুব মাথাব্যথা!

ওকে বলেছিলাম, তুমি তো জানো না—বউ পালিয়ে গেলে মানুষের কীরকম কষ্ট হয়। ও অবশ্য হেসে হেসে কথা বলছে, কিন্তু মনে মনে তো কষ্ট পেয়েছে।

ওর কষ্টের চেয়ে দেখছি, তোমার কষ্টটাই বুকে বাজছে।

বাজছেই তো। জানো ও কী বলেছে?

কী?

আমার জন্যই ওর বউ নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তোমার জন্যে?

হ্যাঁ। তাই তো বললো, আমার সঙ্গে নাকি ওর বউকে মানাতো ভাল। ওর মতে ওকে পছন্দ হয়নি বলেই তার দাঁতকপাটি লেগেছিল। তুমি আর এসব বুঝবে কী করে?

হ্যাঁ সে তো বটেই। গল্পে গরু গাছে চড়ে শুনেছি। কিন্তু এগল্পে তুমি যে গরুর ভূমিকায় নেমে পড়তে চাও বুঝতে পারলাম এবার। আমি হলে আমার স্ত্রীকে কিছুতেই অন্যের হাতে তুলে দিতে পারতাম না। প্রাণ গেলেও না।

শোভনার কথায় হেসেছিলাম। বলেছিলাম, সকলে কি তোমার মতো সাহসী?

সাহসের কথা হচ্ছে না। কেউ যদি কাউকে ভালবাসে তাহলে বিপদের সময় তাকে ছাড়তে পারে?

না পারে না। পারা উচিত নয়। পৃথাও এমনি বলেছিল, আমার কথা ছেড়ে দিন। চাকরির জন্যই তো আমায় এ পাপ কাজ করতে হচ্ছে।

ওকে বলেছিলাম, পাপই যদি মনে করো তো যাও কেন?

আগে কি জানতাম চাকরি পেতে গেলে আমায় এ পাপ কাজ করতে হবে?

এখন তো জেনেছো, এখন ছেড়ে দাও।

ছাড়তে আমি পারি। না হয় উপোসই দেব। কিন্তু আপনার তাতে কী লাভ হবে? আর তা ছাড়া আমি না হলে অন্য কোনও মেয়ে একাজটা করবে। তখন?

আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার যা হবার তা হবে। আমি সব কিছুর জন্যে তৈরি।

তাই বুঝি। কিন্তু আমি বলছি আপনাকে, আপনি না এলেই ভাল করতেন।

কিন্তু পৃথা, তুমি ওকাজ ছেড়ে দাও। এখনও সময় আছে।

তার মানে? আপনি আমাকে খাওয়াবেন?

না। তা নয়!

তবে? তবে, এসব বলছেন কেন? পারবেন আমাকে নিয়ে পালাতে? অন্য কোথাও আমায় নিয়ে সংসার করতে?

পালাতে হবে কেন?

তবে কী করবেন?

কেন, এখানেই তুমি থাকো?

না। তা হয় না। সজলরা তা হতে দেবে না।

তা হলে তুমি কোথায় যেতে চাও?

যে কোন জায়গায়। যেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারব।

এই লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে আমার আপত্তি।

তবে থাকুন আপনার আপত্তি নিয়ে।

দপদপিয়ে চলে গিয়েছিল পৃথা। সেই চলে গেল আর সামনে আসেনি। নিজের মধ্যে হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। শোভনা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। একটু জ্ঞান ফিরে আসতেই মনে মনে বলি, পৃথাকে হারিয়েছি এভাবে। আর হারাতে চাই না কাউকে।

বস্তুত এক ধরনের ক্ষোভ পাগল করে তুলেছিল আমায়। এরকম কেন হল? পৃথা পৃথিবী থেকে বিদায় নিল, আর হামিদা চলে এল আমার জীবনে।

নর্মদাবাবু'র ভীষণ এক বদ অভ্যেস আছে। কাজের সময় সামনে বসে বক বক করবে। আর থাকতে পারি না। বলি, আপনি এখন যান নর্মদাবাবু। কে আবার কোন সময় এসে পড়বে, বড়সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবে তখন আমার চাকরি চলে যাবে। নতুন চাকরি আমার! প্রথম থেকেই তাঁর কুনজরে পড়া ভাল নয়।

যাক্ না আপনার চাকরি, আমি তো আছি, লোকে যতই গাল দিক নর্মদাকে নর্দমা বলে। আমি থাকতে আপনার কোনও ভয় নেই।

না। আসলে আমি বিয়ে করতে চলেছি।

বিয়ে! তা ভাল তো। কোথায়?

বহড়ুতে। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। দিন টিন সমস্ত ঠিক।

ঠিক করেছেন। আরে ব্যাটাছেলের মতো কাজ করেছেন। কিন্তু কোম্পানিতে ভিতরে ভিতরে যে এত ব্যাপার চলছে তা কিছু টের পেয়েছেন?

কোথায় আমি বিয়ে করব। বউ এর বাড়িতেই থাকব। পাড়ার বউ-ঝিরা বউ এর বদলে বর দেখতে আসবে—এই সব বিড়ম্বনার স্বপ্ন দেখছি দিনরাত। তা নয় আপনি বলছেন কোম্পানির ব্যাপার! কোম্পানির ব্যাপার ভাবতে আমার বয়েই গেছে। কোম্পানির ব্যাপার আমি ভাববো কেন। কাজ করি মাইনে পাই ব্যস।

ডিটিপি-র কাজের ফাঁকে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কটা মাস কীভাবে চলে গেল। এই কাজটা বেশ লাগে। কম্পিউটার নিয়ে বসলেই হামিদার স্পর্শ পাই। আমার আঙুলের ওপর ওর আঙুল কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করছে। চটপট কাজ শেষ করে ফেলি। কর্তারা খুশি হয় আমার কাজ দেখে। অবসর সময়ে কম্পিউটারের মনিটরে হামিদার মুখটা ভেসে ওঠে। চোখ বুজে ওর কথা ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু হঠাৎ দেখি যেন কোম্পানির কর্তারা ছোটাছুটি শুরু করে দিল। বড়কর্তার শরীর ভাল ছিল না—কোথায় যেন গিয়েছিলেন। কানাঘুষায় শুনতে পেলাম, কোম্পানির মুম্বাই আর বাঙ্গালোরের অফিসে একই সাথে আয়কর অফিসাররা রেড করেছে। ব্যাপারটা বোধগম্য হল না।

অফিসে এসে দেখি থমথমে ভাব। শ্যামাপদকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, রেড মানে কী গো?

রেড মানে?

শ্যামাপদ একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে, রেড মানে লাল। আপনি তো কিছুই খবর রাখবেন না। কেবল আসবেন আর কাজ করে চলে যাবেন। দুনিয়ায় কত কী ঘটে যাচ্ছে খবর রাখবেন তবে তো!

শ্যামাপদ আমার নিচে চাকরি করে। আমি একজন সামান্য টাইপিস্ট হলেও গালভরা নাম ডিটিপি অপারেটর আর শ্যামাপদ অফিসের 'ডি' গ্রুপ স্টাফ। কিন্তু খবর রাখে সব। কী করলে চাকরিতে উন্নতি করা যায় তার চেষ্টা শ্যামাপদ সব সময় করে। শ্যামাপদ বলে, বেসরকারি চাকরি, এই আছে এই নেই। চিরকাল তো এখানে পিওন-

গিরি করলে চলবে না। ধান্দা করতে হবে। কোম্পানি যেমন ধান্দা করে আমাকেও তেমনি ধান্দা করতে হবে।

ধান্দা করতে হবে! কোম্পানি ধান্দা করে! কিসের ধান্দা করে?

এটা কে রে? কোথা থেকে এসেছে।

শ্যামাপদ চোখ পাকিয়ে অবাক হয়! বলে, আবার কিসের! মাল্লুর!

শ্যামাপদ হাতের ভঙ্গি করে।

তা আমাকে যে ছুটি নিতে হবে। ক'দিন ধরে বড়কর্তা আসছে না। কী করি বলো তো?

সে কী কথা? বড়কর্তা যদি না আসে তো আপনার বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে? একটা মেয়ের জীবন-মরণ সমস্যা, আর আপনার চাকরিটাই বড় হল?

না তা বলছি না। তা হলে কী করা যায়?

কী আর করা যাবে। আপনি চলে যান। বড়কর্তা এলে আমি বুঝিয়ে বলবখন। তাছাড়া বড়কর্তা তো আপনাকে ভালবাসেন।

হ্যাঁ। এই সেদিনই তো বড়কর্তা খুব খুশি হয়ে বললেন, তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট। তোমার নিষ্ঠা আছে। কাজেরও বেশ উন্নতি করেছ। তোমাকে এ মাস থেকে একটা ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছি।

খুব অবাক হয়ে বলেছিলাম, স্যার আমার মোটে ন'মাস চাকরি হয়েছে। ইনক্রিমেন্ট তো বছরের শেষে দেওয়াই রেওয়াজ শুনেছি।

বড়কর্তা হেসে বললেন, এটা প্রাইভেট কোম্পানি। এখানে নিয়ম-কানুন অত আঁটোসাঁটো নয়।

তবু। অন্যরা শুনলে সমালোচনা করবে। আমার খুব খারাপ লাগবে স্যার।

কেন খারাপ লাগবে? তুমি তো কারোরটা ছিনিয়ে নিচ্ছো না। কাজ ভাল করলে অন্যেরাও এই ধরনের ইনক্রিমেন্ট পাবে। পেয়েছেও কেউ কেউ। আনপ্রেসিডেন্টেড কিছু নয়। ডোনট্ অরি।

অফিস থেকে বেরোতে যাব ম্যানেজার নর্মদাবাবু এসে ঢুকলেন।

কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি।

এত তাড়াতাড়ি?

বিয়ে করতে যাচ্ছি।

তা আজকেই বিয়ে করতে চললেন? এদিকে যে সব পয়মাল হয়ে গেল তার খবর রাখেন? আপনার চাকরি থাকবে তো?

এরকম বলছেন কেন?

কেন?

কিন্তু তখন সত্যিই আর কথা বলবার সময় ছিল না। না বের হতে পারলে হামিদা'রা অসুবিধায় পড়ে যাবে।

আমাদের কোম্পানির ওপর সরকারের নজর পড়েছে। এবারে কোম্পানির গুষ্টি তুষ্টি করে ছাড়বে।

শ্যামাপদ এসব কথা অবতারণা করল।

জিজ্ঞাসা করি, কেন এদের কী দোষ?

দোষ নয়? বছর বছর সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেয়।

তাহলে কী হবে?

লড়াই হবে। শ্যামাপদ বলে, সরকার একবার যখন রেগে গেছে তখন আর তো সহজে ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

তাহলে চাকরির কী হবে?

আরে চাকরির কথা পরে ভাববেন। আগে মেয়েটার কথা ভাবুন। বিয়েটা করুন তো গিয়ে।

নর্মদাবাবু মনে করিয়ে দেন চলে যাবার কথা।

তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

সঞ্জয়কে খুশি করতে পারলাম না। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করলাম আমরা।

সাক্ষী হিসাবে আমি সঞ্জয় আর শোভনাকে ডেকেছি। হামিদা এনেছিল ওর বন্ধু সুলতানাকে।

আমার সমস্ত ঈর্ষা, দুঃখ ও যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে হামিদা হয়ে উঠল চমৎকার। শুধু নিজের জন্য নয়, আমার কষ্ট হচ্ছিল হামিদার জন্যও, কাজটা কি সঠিক করলাম।

এসব দার্শনিক চিন্তার জের বেশিক্ষণ থাকে না।

ম্যারেজ রেজিস্টারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সবাই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। কিছু খাওয়া দাওয়া হল। খানিক রঙ্গ-রসিকতাও করল শোভনা। চোরা চোখে আমি সারাক্ষণ লক্ষ্য করছিলাম হামিদাকে। ওকে দেখাচ্ছে একদম সিনেমার সুচিত্রা সেনের মতো। চোখে-মুখে ফুটে উঠছিল সেই লাবণ্য। আমার বুকের মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন গুঁড়ি মেরে মেরে জেগে উঠতে থাকল। এমনই কি হবার ছিল? ভাবলাম, একদিন খুব কাছাকাছি এসেও যে পৃথা প্রত্যাখ্যান করেছে আমাকে আমার তো প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল ওর উপর। কিন্তু সে সুযোগ পৃথা আমাকে দেয়নি। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীরে ঘনিয়ে এল পৃথার প্রতি এক ধরনের বিবমিষা।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সঞ্জয় আর শোভনা চলে যেতে চাইল। যেতে দিলাম না। এক সাথেই ফিরলাম।

দুপুরের ফাঁকা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল। জানালার ধারে আমি আমার পাশে সঞ্জয়। সামনের জানালার ধারে হামিদা, সুলতানা, শোভনা বসেছে পাশাপাশি।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম আমি। কঠোর হয়ে উঠল চোয়াল। আমার সামনে যে নারী উপস্থিত সে আমার স্ত্রী। আমার অধিকার আছে আজ রাতে ওর শরীরে শরীর ঘষে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার। থাকবে না কোনও পিছুটান। থাকবে না কোনও শঙ্কা।

কী চুপ করে আছ কেন? শোভনা প্রথম কথা বলল। তোমাকে হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর লাগছে।

না কিছু নয়। বুঝলাম না শোভনা আমাকে ঠাট্টা করল কি না।

আমি জানি তুমি এখন কী ভাবছ!

কী?

বলব না। পরে বলব।

হামিদা কিছু বলবার আগেই বললাম, হামি তোমাদের বন্ধুকে আর এদের একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে ডাকো না?

হামিদা বলল, হ্যাঁ এসো না একদিন! পরশু রবিবার। আসবে?

সকলেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

হামিদা বাড়িটা নতুন করে সাজিয়েছে। নিজের হাতে জিনিসপত্র যেখানে চেয়েছে সেখানে রেখেছে। বাড়িতে অতিথি আসবে বলে কাজের বউ ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করছে। হামিদার এখন অনেক কাজ। ঘরে ঘরে এখন নতুন পর্দা লাগিয়েছে। ডাইনিং স্পেসের কোনায় কোনায় পেতলের ফুলের ভাস। এককোনায় ক্যাকটাস রেখেছে। সারা বাড়ি জুড়ে ফুলের স্নিগ্ধতা বিরাজ করছে। বারান্দায় কটা ফুলের টব বসানো হয়েছে। খাবার টেবিলের পাশেই রেখেছে একটা সুন্দর অর্কিড। সোফা টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানিতে রয়েছে কটা তাজা গোলাপ। একটা কোণে টেবিলে কম্পিউটার বসানো হয়েছে নতুন, যেটি আমি ব্যবহার করব।

বাড়ি সাজিয়ে হামিদা নিজেই ঘরে ঘরে হাঁটে আর দেখে কোথায় কোনও খুঁত রয়েছে কি না। একটা শোবার, একটা বসার, একটা লেখাপড়া করার, আর একটা ঘর অতিথির জন্য। এরপর কী হামিদা? সব তো হল। মনে মনে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে হামিদাকে। নিজেকেই উত্তর দিই নিজে। সব আর হল কই, এখনও রাত বাকি আছে।

এ বাড়িতে আপাতত আমার কোনও কাজ নেই। দাদাকে একটা খবর দিলে বোধহয় ভাল হতো। সে এলে এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগত ভাবতে চেষ্টা করি। কারও মুখ তেমন মনে পড়ে না। আবছা একটা মুখ ভেসে ওঠে পৃথার। এরকম যদি হতো, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, দরজা খুলে দেখব পৃথা দাঁড়িয়ে আছে। কেমন আছি আমি, পৃথা দেখতে এসেছে। ওকে সোফায় বসাব। তারপর এমন সব কথা বলব, যা কোনওদিন কাউকে বলা হয়নি। অনেক কথা থাকে যা আর কাউকে বলা যায় না। নিজের ভিতরে জমিয়ে রাখতে হয়। এসব কথায় মাঝে মাঝে বুক এমন ভারি হয়ে যায় যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

হামিদা আমার ধ্যানে টোকা দিয়ে বলে, কী ভাবছ এত?

না তেমন কিছু নয়।

তেমন কিছু না-মানে, আমাকে বলো!

বলার মতো কিছু নয়।

বলার মতো না হলেও বলো।

হামিদার কণ্ঠে দাবি, স্ত্রীর দাবি। স্বামী অন্যমনে কিছু ভাবলেও তো শোনার বা জানার দাবি স্ত্রী করতে পারে, কারণ হামিদা আমাকে জীবন সঁপে দিয়েছে। জীবন সঁপে দিলে শরীর যেমন দেওয়া হয়, মনও দিতে হয়।

তুমি কী করছ না করছ, আমাকে জানাবে না? আমি কি তোমার কেউ নই নাকি?

হামিদা, পেটে যার খাবার নেই, গায়ে যার কাপড় নেই, মাথা গোঁজার যার ঠাঁই নেই, তার কাছে জীবন মানে তো যন্ত্রণা—কী বলো?

হামিদা জোরে হেসে ওঠে। বলে, কী সব আবোল তাবোল ভাবছ?

চুপ করে থাকি।

তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করি—কে কে থাকবে এই বাড়িতে? আমি আর তুমি আর?

তুমি আর আমি।

আমি কী করে থাকব বলো তো?

যদি না চাও, থাকবে না। আমি একা থাকব। ব্যস।

একার জন্য এতবড় বাড়ি!

তাই তো থাকি এখন। থাকি না?

আসলে কি জানো। চাকরি বাকরি তেমন করি না।

তোমাকে আগেও বলেছি, তুমি চাকরি না করলেও আমাদের চলবে। ভয় পেয়ো না।

তবু শুকনো মুখে বসে থাকি।

হামিদা আমার শুকনো মুখের সামনে নিজের হাসি মুখটা নিয়ে আসে। বলে, তুমি খুশি হওনি?

খুশির কী আছে বলো?

খুশির কিছুই নেই?

কী আছে? এতদিন ভ্যাগাবন্ড ছিলাম। এখন একটা আস্তানা হল। এই জন্য খুশি?

দেখ আমার বাবা-মা ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন না। তাঁরাও প্রচুর সংগ্রাম করেছেন। আবার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আমরাও ওঁদের মতো জীবনকে পূর্ণতা দেব। জীবনে সংগ্রাম তো করতেই হবে। জীবন অর্থহীন হবে কেন?

জোরে হেসে উঠি।

কী হাসছ যে?

হাসতে হাসতেই বলি, হামিদা তুমি খুব আশাবাদী।

নিশ্চয়ই। তুমি নও?

না।

হামিদা সোজা হয়ে বসে। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না?

স্পষ্ট স্বরে বলি, না।

আশ্চর্য!

হামিদা গা ছেড়ে দেয় সোফায়। হাত বাড়িয়ে আমার হাত দুটিতে আঙুল বুলিয়ে দেয়। বলে, তাহলে তুমি কি বলতে চাও তুমি বিশ্বাস করো না যে ঈশ্বর আমাদের গড়েছেন পরস্পরের জন্য?

ওর সামনে থেকে চোখ না ফিরিয়ে বলি, না।

বেশ। পরে কথা হবে। বন্ধুরা সব এসেছে, এখন চলো ওদের কাছে গিয়ে বসি।

ঘরোয়া ছোট্ট একটা পার্টি। হামিদা কয়েকজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছে। ওর বাবা

আসতে পারেননি, আটকে গিয়েছেন অফিসের কাজে। অন্য দিনের তুলনায় বাড়িটাতে আজ আলো জ্বলছে বেশি। তবে ঘরের মধ্যে আলো কম। খাবার টেবিলে হামিদা মোম জ্বেলে দিয়েছে। এ সবই ওর ইচ্ছেমতো হয়েছে। সিডিতে চলছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানের দিকে কারও কান নেই। একা একাই শুনছি আমি। এইসব রিমেক গান আমার ভাল লাগে না। পুরনো গায়কদের গান আবার সিডিতে পাওয়া যায় না।

হামিদার বন্ধুরা সব হেসে ওঠে।

থালা সাজিয়ে ও পরিবেশন শুরু করে।

আমরা নিজেরা নিয়ে নিতে পারব। তুমিও বসে যাও। ওর বন্ধুরা বলে।

টেবিল ভরা খাবার। সামান্য কিছু হামিদা তৈরি করেছে নিজের হাতে। বাকি সব এসেছে হোটেল থেকে।

কেমন লাগছে আপনার?

আমায় প্রশ্ন করে সবাই হাসিতে উথলে ওঠে। হামিদাকে খুব সুন্দর লাগে। ওর বন্ধুদের কারও বিয়ে হয়নি। গল্প করতে করতে একজন বলে, এরকম ঘরে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তোর মতো একটা চাকরি-টাকরি পেলে ভাল হতো।

দেখ না আব্বা আর পড়াতে চাইছে না। আমি বললাম এম.এ-টা করব। তা নয় বসে বসে মুটিয়ে যাচ্ছি।

খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্প হল। সুলতানা আমাদের সাজানো বাসর ঘরে এসে ঢুকল। বলল, ওরে মেয়েরা তোরা বরকে আর বিরক্ত করিস না, বর এখন ঘুমুবে—

একটা হামিদার বয়সী মেয়ে বলল, তুমি যাও তো এখান থেকে পিসি। বর এখন আমাদের, আমরা যা বলব তাই করবে।

তা হলে বাবা, আমি চলি।

সুলতানা হেসে চলে যেতেই সেই মেয়েটি বলল, আজকের রাত্তিরে বর কি একা হামিদার! বর আজকে আমাদের সকলের, কী ভাই বর রাজি তো?

মাথা নাড়ি। বলি, আপনারা যা ভাল বুঝবেন, তেমনিই হবে।

ও মা, এ যে দেখছি খুব সেয়ানা রে! বলি হ্যাঁ গো বর আমাদের মেয়েকে কোলে করতে পারবে?

আগে তো কোনও দিন কোলে করিনি। আপনারা বললে, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ওলো তোর বরের কথা শোন। সকলের সামনে হামিকে কোলে করতে হবে কিন্তু।

তা আপনারা যদি বলেন তো শুধু ওকে কেন আপনাদেরও কোলে তুলতে পারি।

সবাই হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। ওমা, কী অসভ্য বর মাইরি!

কী হল, কী হল—বলে সুলতানা আবার এসে ঘরে ঢুকলো। সব শুনে বলে, তা আমাকে কোলে করো দিকি ভাই, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা!

আমি উঠে দাঁড়াতেই ভয়ে সরে গেল। ওমা, এযে সত্যি সত্যি তুলতে আসে। না না অত ক্ষেমতায় কাজ নেই। ওরে তোরা হামিকেই তুলে ওর কোলে বসিয়ে দে।

হামিদা এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার মুখ খোলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু।

আজকের দিনে বরের কোলে বসতে হয় ভাই। একটুখানি বস, আমরা দেখে নয়ন সার্থক করি।

কী হচ্ছে কী! হামিদা নড়ে না। পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে থাকে। বলে, আঃ কি করছো কি! মেয়ে মহলে বাহাদুরি ফলিয়ে ছেলেমানুষি করতে হবে না।

সুলতানা বলে, রাত পোয়ালে তখন আমরা তো কেউ আসব না। আর আসতে চাইলেও কেউ আসতে দেবে না। আজকের মতো একটু আনন্দ করে নিই। আয় ভাই একটু বস দেখি।

কিন্তু টানাটানি করেও কোনও ফল হল না।

মেয়েদের কথার রাজ্যে আমি কোনও মন্তব্য করি না।

হঠাৎ সবাই তালি বাজিয়ে জোরে হেসে ওঠে।

অ্যাই কী হচ্ছে! আমি এবার শাসন করি।

প্রতিবেশীদের ঘুমের অসুবিধা হবে যে!

উফ্ ওদের এখন ঘুমের চিন্তা হচ্ছে রে! চলরে সব বাড়ি চল।

কথাটা বলে আমি লজ্জায় পড়ে যাই। হামিদার বন্ধুরা সব এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

সুলতানার বাবা মনসুর সাহেব সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। হামিদাকে এবার খুব মিস করবেন তিনি, বললেন সে কথা। সবাইকে অবাক করে বিশেষভাবে তিনি ধন্যবাদ দিলেন হামিদাকে। ওর সাহসিকতার কথা বারবার বললেন। হাসনাত, জব্বার অহেতুক মনে করল হয়তো ওঁর এসব কথা। নিজেদের মধ্যে বার কয়েক দৃষ্টি বিনিময় করে নিল ওরা।

চলে যাবার আগে হামিদা তাঁর কাছে এসে বললো, প্রশংসা পাবার মতো তেমন কিছুই করিনি।

মনসুর সাহেব বললেন, আমার বয়স হয়েছে। কোথায় কখন কাকে ভাল বলতে হবে সে জ্ঞান এখনও হারাইনি, বুঝলি মেয়ে? দেখেই বুঝেছি খুব পয়মন্ত বর পেয়েছিস তুই। খোদা তোর মঙ্গল করুন।

শুনে হামিদার চোখ কেমন ভিজে এল। ভাবল হয়তো এদের সবাই ভেতরে ভেতরে এমনি।

ঘুরে ঢুকে টের পাই উত্তরের জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। অথচ বিকালে ঘামছিলাম। বিকালে পাখা চালিয়েছি ফুল স্পিডে। আর রাত দশটায় খাটে বসে মনে হল ঘরটা সত্যি আজ ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। হালকা পারফিউমের ঘ্রাণ ওড়াওড়ি করছে ঘরের ভিতরে।

আবছা আলো ঘরে। হামিদার বন্ধুরা সব চলে গেছে।

ঘর এখন ফাঁকা। শুধু আমরা দুজনে ঘরের মধ্যে।

চা খাবে নাকি? উঠে দাঁড়ালাম।

হামিদা উত্তর দেয় না। নখের তলায় ময়লা খোঁটে।

বিছানায় হামিদার পাশে এসে বসি। বলি, তাহলে হামিদা আমরা এখন স্বামী স্ত্রী।

হামিদা হাসে। বলে, বুঝলে আমি যে পরিবারে বড় হয়েছি, সে পরিবারে একটা

সময় প্রেম করা বা প্রেমে পড়া ব্যাপারটা ছিল নিষিদ্ধ। এমন কি প্রেম শব্দটা উচ্চারণ করাও ছিল একই রকম নিষিদ্ধ। নিষেধ সত্ত্বেও যখন পরিবারের কেউ লুকিয়ে প্রেম করে ফেলেছে বা প্রেমে পড়ে গেছে, বিপদে পড়েছে। সে সব ভীষণ ব্যাপার। মনে পড়লে ভয় লাগে।

ওকে বলি, আর তুমি যখন ইয়ে করলে তখন কী হল? না সবাই বলল ওই বখাটে হিন্দু ছেলেটা তোমার সর্বনাশ করে দেবে তাইতো?

না। তা নয়।

তবে?

আমাদের বাড়িতে এমন কেউ নেই যে যার ভয়ে আমাকে আকাশ থেকে পড়ে ভয়ে লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে খোদার কসম কেটে বলতে হবে—না, কারও সঙ্গে আমার কোনও ইয়ে নেই।

সত্যি?

সত্যি।

আমি ভাবলাম তুমি না কত সাহসের কাজ করে ফেলেছ।

তাই বুঝি!

ঠিক তাই।

ওর হাত দুটো ধরে ওর কাছে সরে আসি। সরে আসি ওর ধুকপুক করা বুকের কাছে। হামিদা ছিটকে সরে যায়। আর ছিটকে সরে যাওয়া হামিদাকে টেনে এনে বুকে জড়িয়ে ধরি। বুকে গাঢ় আলিঙ্গনে ওকে পিষে গভীর চুমুতে ডুবে যাই। চোখে চোখে নয়, কথা হয় জিভে জিভে। অমৃতের মতো পান করি হামিদা সুধা।

কী হচ্ছে কী। হামিদা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়। চুমুর এমন গা বিবশ করা স্বাদে ওর শরীর কাঁপে।

নিবিড় কণ্ঠে বলি, আমাকে পান করতে দাও হামি। আমাকে পান করতে দাও।

তুমি আমাকে পাগল করে দেবে তপন। হামিদা বলে।

চুম্বন এত গভীর হতে পারে জানতাম না। হামিদার সমস্ত শরীর অবশ মতো হয়ে আসে। তার অবশ শরীরটাকে তুলে তুলো মেঘের মতো নরম বিছানায় শুইয়ে দিই।

কী সুন্দর তুমি, হামি আমার। ওর সারা শরীর চুমুতে ভরিয়ে দিই। চোখ বুজে থাকে ও।

এত সুখ, এত আনন্দ আমি জীবনে কখনও পাইনি। জীবনে কখনও আসবে ভাবিনি। এই নির্মম কঠোর শুষ্ক পৃথিবীতে ভালবাসা এত গভীর হতে পারে, মিলন যে এত অসম্ভব সুন্দর হতে পারে, আগে কখনও অনুমান করিনি।

কী করলে বলো তো?

কী করলাম?

জানো না বুঝি কী করলে। হামিদার ঠোঁটে কামড়, মুখে হাসি, চোখে শরম।

অন্যায় কিছু করেছি কি? ওর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করি।

ওর চোখের নীল তারায় আমার মুখ দেখি। ওকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার আপত্তি ছিল?

হামিদা দু হাতে মুখ ঢাকে। ওর হাত সরিয়ে দিই। ওর চোখে চোখ রাখি।

আপত্তি ছিল?

হামিদা হেসে নামিয়ে নিল চোখ। ও ঘেমে যাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে ওর মুখে, কপালে। পাখা ফুল স্পিডে চলছে, তবু ও ঘামছে। ওর চুল উড়ছে। আঁচল খসে পড়ল। আঁচলে মুখ মুছতে যায় হামিদা। ওকে বলি, এসো আমরা মাছ-মাছ খেলি আবার।

কাজের বউটার নাম যে সাবিত্রী জানতাম না। এক বালতি গরম জল নেব বলে দাঁড়িয়েছিলাম। রান্নাঘরে হামিদার জটলা, কাজের বউয়ের সঙ্গে কিচকিচ অশান্তি। সাহস পাচ্ছিলাম না। বেলা বাড়ছিল। এগিয়ে গিয়ে 'আমার একটু গরম জল চাই, বলার জোর পাচ্ছিলাম না। খুব বিব্রত বোধ করছিলাম। আমার অসহায়তা দেখে কোথা থেকে সাবিত্রী এগিয়ে আসে। পাশে দাঁড়িয়ে বলে—তখন থেকে দেখছি বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন বালতি হাতে। আমাকে দিন, আমি এনে দিচ্ছি। কখন স্নান করবেন আর কখন বের হবেন? দিন তো? লজ্জা করবেন না।

বলে আমার হাত থেকে বালতি ছিনিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল সাবিত্রী। হামিদা আমাকে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, কিন্তু কোনও করুণা করেনি। এখন সাবিত্রী রান্নাঘরে ঢুকতেই গ্যাস ছেড়ে দেয়। সাবিত্রী জলভর্তি বালতি কলঘরে বয়ে নিয়ে এসে বলে—বয়েও দিলাম, তবে আজ উপকারের দাম চাইব না। 'দেবদাস' আসছে, 'দেবদাস' এলে দেখার পয়সা দিতে হবে। বলেই আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সদর দরজা খুলে বের হয়ে যায়।

পরের দিন ভোরে চলে আসে। দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে সাবিত্রীকে দেখে অবাক হই। চুলগুলো তেল দিয়ে টানটান করে বাঁধা। কাল অত উপকার করেছে বলে কি ওকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমার? ভাবছিলাম, আমার পাশ দিয়ে বাড়ি ঢোকে সাবিত্রী।

বাসন মাজা, রান্না করা, জামা-কাপড় ধুয়ে ইস্তিরি করা সবই সাবিত্রীর দখল ও যত্নে চলে এল। মুখ খুলতেই পারি না। এটাই বোধহয় সাবিত্রীদের বড় গুণ। এই গুণের সাথে বেঁধে দেখলে ওদের রূপও হয়ে ওঠে আশ্চর্য মায়াবী।

সাবিত্রী ঠিক কোথায় থাকে জানি না। ও সবার সাথেই পরিচিতের গলায় খুব স্বাভাবিক কথা বলতে পারে, কী করে পারে বুঝে পাই না। ঝি-দাসীদের চরিত্রের বোধহয় এটাই স্বাভাবিকতা।

সন্ধ্যার কিছু পর রান্নার কাজ শেষ হয়। সাবিত্রী চলে যাবে। চলে যাবার আগে আমার কাছে আসে। বলে, আমি যাচ্ছি, একটু বাদে গ্যাসটা অফ করে দেবেন। দুধ উতলে যাবে।

ঠিক আছে। আমি উত্তর দিলাম।

গ্যাস লিখিয়ে রাখবেন। শেষ হয়ে আসছে।

হ্যাঁ।

সাবান?

এনে রাখব।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের আলো ছেড়ে সাবিত্রী বারান্দার ছায়া ভেঙে সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় চলে গেল। সাদা চোখে অন্ধকার শুধু কালো হয়ে ঘরের আলোয় চমকাতে থাকল।

বামপন্থী রাজনীতি করতে গিয়ে যৌবনের কাক-ভোরে আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল। বুঝেছিলাম, কী জটিল সব মানুষের মুখ। মানুষ মানুষের মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ গঠনের চেয়েও জটিলতর। তারপর থেকে এক অজ্ঞাত অবসাদ আমাকে জীবনের ভিন্ন দিকে ছুটিয়ে দিয়েছে। বেশিদিন ধরে রাজনীতির সেবা করার খিদে আমার তাই ছিল না। সে দিক থেকে ভাবলে আমি এক পলাতক। মানুষ বাইরে পালায় এক ভূগোল থেকে অন্য ভূগোলে। কিন্তু ভেতরে থাকে নিঃশব্দ পলায়ন। সেখানে সে তার জৈবনিক কৌতুক ফুরিয়ে নিজেকে নিস্তরঙ্গ রাখতে ভালবাসে।

এই হাফটাউন গ্রাম্যতায় হামিদার সঙ্গে আমার সহবাস, আমি লোকটা কেমন ছিলাম তার আগে। সাবিত্রী অনুভব করে, আমার কিছু চেপে রাখা দুঃখ আছে। যা কখনও আমি তাকে বলব না। কেন বলব, আমি কোথায় আর ও কোথায়? কিন্তু আমাকে তার কত কথা বলা প্রয়োজন। আমি শুনতে না চাইলেও, বলবে।

রবিবার দুপুর। হামিদা টিভিতে কি একটা অনুষ্ঠান দেখছে। খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় গা আলগা দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। সাবিত্রী খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে ওকে দেখলাম। শুধোলাম—কিছু বলবে?

হ্যাঁ। সাবিত্রী নখ খুঁটে জবাব দিল।

বল।

আপনি আমার বাড়ি দেখেছেন?

না।

ঘরের পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলল সাবিত্রী। বলল—এই জানালায় দাঁড়ালে আপনি আমার ঘর দেখতে পাবেন। ওই আমার উঠোন। আমার ঘর। এই জানালা আমি ইচ্ছে করে বন্ধ করে রেখেছি।

কেন?

আপনি খুলবেন বলে।

তাতে তোমার লাভ?

সাদা চোখে যা দেখা যায়, তার বাইরে কি কিছুই আপনারদেখতে ইচ্ছে করে না? ভেবেছিলাম, একটা হাওয়া আসবে বলেও তো জানালাটা খুলতে পারেন, তা কিন্তু দেখলাম না।

হেসে বলি—ওখানে একটা জানালা আছে, খেয়াল করিনি। আচ্ছা বেশ পাল্লাটা ভাল করে খুলে দাও।

সাবিত্রী আরও একটি পাল্লা খুলে পাশে ঠেলে দিল। তারপর বলল—এখানে এসে দাঁড়ালে সব দেখতে পাবেন, আমি দড়িতে শাড়ি মেলে দিই।

দেখে আমার লাভ!

আপনি সব সময় লাভ-ক্ষতির হিসেব করে চলেন?

তা দেখতে হয় বইকি। আমি জানি আমি কী। তাই আমাকে হিসেব করে চলতে হয়।

নাক কুঁচকালো সাবিত্রী। তারপর ভীষণ সুখী বউয়ের মতন হাসল। বলল—আমার একটা গুণ আছে জামাইবাবু। আমি ভালমানুষদের চিনতে পারি। ভালমানুষদের চিনতে আমি যেদিন ভুল করব, সেদিনই আমার মরণ হবে। বেশির ভাগই দেখি ওপরে ভাল, ভেতরে খারাপ।

আমার মধ্যে ভাল কী দেখলে?

ভালমানুষ পাশে থাকলে কী হয় শুনবেন?

কী হয়?

সাবিত্রী বলে—প্রথমে ভাল মানুষরা আমাকে 'তুই' বলে ডাকে। পরে যখন বুঝতে শেখে, তখন 'তুমি' করে কথা বলে। আমি ওদের কাউকে কাউকে 'আপনি' অব্দি ঠেলে তুলতে পারতাম। কিন্তু ঝি হয়ে সেই অসম্মান কি করা যায়? বেমানান কথা। সমাজ সইবে না। একজনের বেলাতেই কেবল নিচে নামবার ইচ্ছে হয়েছিল আমার, নামিনি। ভালমানুষের কেন ক্ষতি করব? আমার কারণে কারও সংসার ভাসবে, সেটা কি ঠিক? আপনার কি খুব খারাপ লাগছে এসব শুনতে?

ভালও লাগছে না। গম্ভীর গলায় জবাব দিই।

ওর কথাগুলো শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। মনে খটকা লাগে—এ মেয়ে কিছুতেই ঝি হতে পারে না। সাবিত্রীকে অন্য কিছু মনে হয়।

সাবিত্রী বলল—জীবনের চাপে কোথাকার মানুষ কোথায় যায়! পালিয়ে পালিয়ে জীবনটা কেটে গেলেই বাঁচি।

এসব কী কথা বলছে সাবিত্রী? পালিয়ে পালিয়ে জীবনটা কেটে গেলেই বাঁচি—এ তো আমার কথা। নাকি আমার খারাপ হবার ভয় ধরিয়ে দয়ার দাবী তুলতে চাইছে?

বিছানা ছেড়ে উঠে এসে জানালার কাছে দাঁড়াই।

সাবিত্রী বলে—আমার বাড়ির উঠোন দেখতে পাচ্ছেন?

আশ্চর্য হয়ে দেখি—একটা ছোট্ট ঘর। উঠোনটা পরিষ্কার। সন্ধ্যামণির গাছ। এক কোণে তুলসী মঞ্চ। দুটো ছাগল বাঁধা আছে দাওয়ার খুঁটিতে। খুঁটির মাথায় এক ঝাড় বটপাতা বাঁধা। সামনের পা দুটো তুলে তুলে ছাগল দুটো তাই খাচ্ছে। সাবিত্রী পালিয়ে বেড়ায়? আমার কাছে দয়া চায়—কেন?

আরও একদিন দুপুরবেলা সাবিত্রী বাথরুমে জামাকাপড় কাচছিল। অনেকক্ষণ থেকে শব্দ কানে আসছে। বারান্দার চেয়ারে বসেছিলাম। জ্বরজ্বর হওয়ায় কাজে যাইনি। ঘুম ঘুম আবেশ এসে যাচ্ছিল। তাই উঠে ঘরে যাচ্ছি, দেখি বাথরুমের দরজার মুখে বসে সাবিত্রী ওদিকে মুখ করে পিঠ পিছনে রেখে কাপড়চোপড় দুহাতে আছড়ে আছড়ে পরিষ্কার করছে। সারা গা দুলছে। পিঠে কোন কাপড় নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন, তৈলাক্ত মসৃণ পিঠের পেলবতা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

আমি যে ঘরে ঢুকতে পারি সাবিত্রী খেয়াল করেনি। কিন্তু সবটাই যদি ওর ভান হয়? ভাবতে গিয়ে চমকে উঠি। ভালমানুষ খোঁজে কেন সাবিত্রী? ভালমানুষ বলতে

কি বোঝাতে চায়? যারা খুব দয়ালু? এসবের মানে কী? সাদা চোখে কিছুই তো বুঝতে পারি না।

ঘরে ঢুকে শুকনো কাশি। সাবিত্রী আচমকা চোখ তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। হাতের জল ভেজা কাপড় ফেলে ভিজে হাতে পিঠে কাপড় ফেলে দেয়। তারপর চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। কী যেন ভাবে। মনে মনে হয়তো অঙ্ক কষে। শরীরটাকে বিছানায় ছেড়ে দিই। সাবিত্রী বাথরুম ছেড়ে খোলা ছাদে গিয়ে কাপড় মেলে দেয়।

শুয়ে শুয়ে ভাবি, মুসলমান সমাজেও স্বর্গ-নরক ভাবনা আছে। স্বর্গ হচ্ছে বেহেস্ত যেখানে হুরী, পরীরা থাকে। নরক হচ্ছে শয়তানের রাজ্য। শয়তান হচ্ছে দজ্জাল। মানুষকে লোভ দেখায়—আমাকে আল্লা বলে সম্বোধন করো, তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেব ; আর খোদা বলে যদি আমাকে মান্য না করো, তোমাকে দোজখে ছুড়ে ফেলে দেব। কী চাও তুমি? স্বর্গ কিংবা নরক, বেছে নাও।

বোকা মানুষ। লোভী। দুর্বল মানুষ। দজ্জালের জাদুতে ভুলে আত্মসমর্পণ করে। দজ্জালের স্বর্গ তো স্বর্গ নয়, আসলে সেটা হচ্ছে হাবিয়া। মানুষ তা বুঝবে কী করে? সে তো একবারও দজ্জালের কপালে চেয়ে দেখে না যে সেখানে লেখা রয়েছে, কাফ-ফে-রে কাফের। হায়! দেখলে এ পৃথিবীটা অন্যরকম হতো!

ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে গলায় ঢেলে নিই খানিকটা। গোটা বাড়িটাকে ভীষণ নির্জন মনে হয়। সাবিত্রী বোধ হয় ছাদে এখন। গোটা বাড়িটাতে নিজেকে মনে হত একা। এখানে আমার একজন স্ত্রী আছে। দেশে আমার দাদা তার পরিবার আছে। রক্তের সম্পর্কের আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন এখানে-ওখানে আছে। এত মানুষজন থাকতেও এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমি একদম একা। বাবা-মা যখন বেঁচে ছিল, তখনও। এখন নেই, এখনও।

দাদাবাবু চা খাবেন? সাবিত্রী জানতে চায়।

দেখি স্নান সেরে নতুন কাপড়, কপালে সিঁদুর পরেছে।

না। আমার এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

তাহলে চলি। আমি আবার সন্ধেবেলায় আসব।

সাবিত্রী চলে যায়।

ওদিকে কোলকাতা আর এদিকে বহড়ু। নতুন শহর গড়ে উঠছে। বাড়ি ঘর রাস্তা ঘাট সব নতুন নতুন গড়ে উঠছে। কোলকাতা শহর তার আশেপাশের এলাকাগুলো গ্রাস করে ফেলেছে। এই নগর সভ্যতা নতুন এক সভ্যতার জন্ম দিচ্ছে। গঞ্জ শহর তৈরি হচ্ছে। শহরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শহর। বাড়ছে পৌরসভার সংখ্যা। কমছে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। আগে শহরে থাকত ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, দালালরা। এখন শহরে ব্যবসায়ীর সংখ্যা আরও বেড়েছে, বেড়েছে ঠিকাদারদের সংখ্যা, এরাই সমাজে এখন কেষ্টবিষ্টু। দালালি এখন ভদ্র হয়ে নাম বদলেছে—নাম হয়েছে প্রমোটারি। প্রমোটার আর স্পনসরার-এ এশহর এখন ভর-ভরাট।

প্রথম যেদিন এখানে এসেছিলাম, তার সঙ্গে এই জায়গার কোনও মিল নেই। রেল লাইনের দুপাশে সার সার বাড়ি তৈরি হচ্ছে। উঁচু উঁচু বাড়ি. বড় বড় ফ্ল্যাট। ইঁট, কাঠ, লোহা, সিমেন্ট। বড় বড় খাঁচা উপরে উঠছে। অজপাড়া গাঁ ক্রমশ শহর

হচ্ছে। ছাদের পর ছাদ উঠছে। এক-একটা বাড়ি শেষ হয়, আর নতুন লোকজন আসে গাড়ি করে। খাট, টেবিল, চেয়ার, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন এসব আসবাব আসে। দুদিনেই রাস্তাঘাটের চেহারা পাল্টে যায়।

গাড়িতে করে যাই আসি, আর চেয়ে চেয়ে দেখি। চারদিকেই এ ভাবে নতুন নতুন শহর তৈরি হচ্ছে। কাগজ খুললেই বিজ্ঞাপন, ফ্ল্যাট চাই, ফ্ল্যাট নেবে গো। লোহা, ইট, কাঠ, সিমেন্ট, বালি দিয়ে নিজের নিজের স্বপ্নপূরণ করছে মানুষ; নিজেদের ভবিষ্যৎ পাকা করে তুলছে। আমিও বোধহয় সেইরকম পাকা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।

শ্রাবণের শেষ। এই শেষ শ্রাবণে বৃষ্টি নেমেছে। ক'দিন ধরেই পড়ছে। পড়ছে তো পড়ছেই। থামবার কোনও লক্ষণই নেই। মনে হচ্ছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ যে কোনও দিন নীল ছিল মনে পড়ে না। আকাশের রঙ এখন ধূসর। মনে হয় একটা ময়লা চাদর কেউ যেন টাঙিয়ে দিয়েছে। থইথই করছে পুকুর, ডোবা, জলা। পাখিগুলো সব কোথায় লুকিয়েছে কে জানে। ব্যাঙ ডাকছে থেকে থেকে। স্টেশন যাওয়ার পথে অনেকদিনের পুরনো বটগাছটা পড়ে গেছে। বিশাল ওই গাছের গুঁড়িটাকে দেখে মনে হয় যেন মহাভারতের ভীম ধরাশায়ী হয়েছে।

খুশিই হয়েছিল হামিদা। খুব সুন্দর সংসার করছে। সংসারের হিসেব রাখা। নিয়মিত অফিস করা। আমার কম্পিউটার শেখার তদারকি করা। কোথা থেকে কোথায়, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ এরই মধ্যে আমায় নিয়ে কোলকাতা পাড়ি দেওয়া। ভাল জীবিকার জন্য, সংসারের জন্য সবই করতে হয় হামিদাকে।

খুশি নিশ্চয়ই হয়েছিলেন মোতি সাহেব। নইলে কম্পিউটার কিনে দিলেন কেন? বললেন, কম্পিউটারটা শিখে নাও ভাল করে, এতে তোমাদের দুজনেরই কাজের সুবিধা হবে।

ছোট্ট একটা যন্ত্র। কিন্তু যেন বিশ্বজয় করা যায় এর বোতাম টিপে। মাসখানেক খুবই ধকল গেল। সকালবেলায় বেরিয়ে যেতাম কম্পিউটার ক্লাস করার জন্য। দুপুরবেলা খাওয়ার জন্য সামান্য বিরতি, দুটো মুখে দিয়েই আবার কম্পিউটার নিয়ে বসতে হতো। সন্ধেবেলা কোনও রকমে গড়াতে গড়াতে বাড়ি ফিরতাম। শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, কিন্তু তবু বেশ লাগত। পুরুষমানুষ কাজ না করতে পারলে হয়! কেমন যেন নিজেকে অসহায় মনে হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ডিটিপি সবটা রপ্ত করে ফেললাম। এবারে প্র্যাকটিশে জোর দিলাম।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে আলস্য ধরে। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। সারা শরীর ব্যথা করে। আর মন? মন কি ব্যথা পায় না? কে জানে মনের খবর! নিজের মন নিয়ে কখনও তো মাথা ঘামাবার সময় পাইনি। একবার এক জায়গায় একটু মাথা ঘামাবার সময় এবং সুযোগ হয়েছিল কিন্তু সে সব তো ভুলে যাবারই কথা। ভুলে যাওয়াই ভাল।

মাথা ঝিমঝিম করে। সব কেমন এলোমেলো লাগে। মনে হয় কোথাও যেন কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় আমি যেন একটা বিরাট শিকলে বাঁধা, যদি পারতাম বন্ধন ছিন্ন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে! মনে হয় এ দেশ আমার নয়। মনে হয় এখানে

আমি পড়ে আছি কেন? আমার দেশ সেই কান্দীর এক অজ পাড়াগ্রাম। যেখানে আমাদের চাষের জমি আছে, আমাদের বাড়ি আছে, দাদা আছে সেখানে। আমার চারপাশ সব অচেনা, এখানে আমার হাঁপ ধরে যায়। এ কী রকম সুখ! এ কীরকম বেঁচে থাকা? এ বেঁচে থাকায় কোনও সুখ পাই না!

কেবলই মনে পড়ে যায় পৃথার কথা। আজকাল ওর কথা মনে পড়লে ভয়ও করে। ভয় করে পৃথা কি আমারই জন্য নিজেকে শেষ করেছে? আমাকে পাওয়া না পাওয়ার বেদনায়, হতাশায় আর দীর্ঘশ্বাসে? কেন? কিসের জন্য?

রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে কোনও কোনও দিন এসে যায় পৃথা। ওর চেহারা দেখে চমকে উঠি। এ কী চেহারা হয়েছে? কোথায় গেল সেই আগুন জ্বালানো রূপ; কোথায় গেল সেই লাবণ্য!

পৃথা অভিমানী গলায় বলে, তুমি কাপুরুষ!

অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে থাকি। মুখেই যত খই ফোটাই। কই সেদিন যদি পারতাম পৃথাকে বোঝাতে, তাহলে সজলরা কি ওকে ছেড়ে দিত? পৃথাকে আত্মহত্যার রাস্তায় যেতে হতো না! আহ্। পৃথা তুমি যদি একবার আমায় বলতে তোমার সমস্যার কথা!

হামিদা দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। চুমুক দিই। দারুণ ফ্লেভার। দামী চা আমার খুব প্রিয়।

তোমার জন্য আনিয়েছি। কেমন?

দারুণ!

হামিদা চেয়ারে বসেছে। আমি ওর পায়ের কাছে মেঝেতে বসি। ওর কোলের ওপর মাথা রাখি। চা পান করতে করতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় হামিদা। বলে, ওঠ স্নান করে নাও। বাজারে বের হব একসাথে।

অদ্ভুত শান্ত স্বর হামিদার। আগের সেই অস্থিরতা নেই ওর মধ্যে। ওকে হাতের কাছে পেয়ে শরীরী আনন্দে মেতে উঠতে চাই। হামিদা আমাকে শান্ত করে। বলে, এখন নয়। আমি তো রয়েছিই। এখন স্নান করে নাও। আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করছি।

হামিদা এখন অনেক বেশি পরিণত, অনেক ধীর স্থির। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সিঙ্কে কাপ রেখে আসে। চিরুনি নিয়ে এসে মেঝেতে বসে চুল ছাড়ায় হামিদা। আলতো করে ওর দিকে হাত বাড়াই।

দুটি হাতের স্পর্শ শুধু। সুখ নেমে আসে, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে। স্বপ্নালু দুটি চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি আমি। দেখি গভীর সমুদ্র ডানা মেলে দিয়েছে ওই চোখ দুটিতে। ওই ডানার উপর ভর করে আমরা দুজনে উড়ে যাই। অনেকক্ষণ—কতক্ষণ জানি না। হামিদা বলে, তোমার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।

তোমার কাছেও অনেক কিছু শেখার আছে।

আমার চেয়ে অনেক কিছু বেশি জানো তুমি।

কী জানি, তোমার থেকে বেশি?

তুমি জানো, তুমি কী জানো।

না জানি না, তুমি বলো।

তুমি বলো।

তুমি বলো।

আমি তো জানি না।

জান। বলবে না।

কেন, বলব না?

ইচ্ছে।

বেশ ইচ্ছে তো ইচ্ছে।

আমারও একটা ইচ্ছে আছে।

কী শুনি?

এ শোনার জিনিস নয়।

তবে কীসের জিনিস?

অনুভবের।

অনুভবের?

হ্যাঁ। চোখ বোজ। চোখ বুজে অপেক্ষা করো।

হামিদা চোখ বোজে। চোখ বুজে ও অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে আমার দুষ্টুমির, আমার স্পর্শের, একটা প্রলংয়করী ঝড়ের।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর চোখ খোলে হামিদা। দ্যাখে আমি ওর থেকে অনেক দূরে, বিছানায় শুয়ে হাসছি।

কী? কিছু অনুভব করছো?

তবে রে। দুষ্টুমি হচ্ছে আমার সাথে।

হামিদা উঠে আসে বিছানায়। আমার বুকের ওপর মাথা রেখে শোয়। দু বাহুতে ওকে শক্ত করে বাঁধি। বলি, তৃষ্ণার জন্য আমার এক ফোঁটা জলের প্রয়োজন ছিল। তুমি আমাকে উজাড় করে সমুদ্র ঢেলে দিয়েছ। এত আমার পাওনা ছিল, কোনওদিন কল্পনা করিনি। আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন, তাড়া খাওয়া আমার জীবন। ভাঙা মেরুদণ্ড, কুঁকড়ানো এই জীবন, যার তলিয়ে যাওয়ার কথা। সেই আমি একটা চর পেয়ে গেলাম।

আবেগে আমার চোখ বুজে আসে। বোজা চোখের ওপর নেমে আসে হামিদার ঠোঁটের স্পর্শ। ওর আদর আমার সমস্ত শরীরে অনুভব করি। হৃদয়ের যত গভীরে যাই, যত অতলে, টের পাই—এ নিছক মিলন নয়, এ গভীর গহন ভালবাসা। এ শরীরকে শুদ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে, শীতল করে। হৃদয়কে করে প্রফুল্ল, প্রশস্ত, প্রোজ্জ্বল।

হায় পৃথা! একবার যদি দেখতে পেতে আমি কেমন ভালবাসতে পারি! তোমার জীবনও এমনি আনন্দে ভরে উঠত। একটু যদি অপেক্ষা করতে। জীবনের আশ্চর্য সুন্দর রূপটি না দেখেই তুমি চলে গেলে। এতে কি তুমি শান্তি পেলে? তুমি জানতেও পারলে না জীবনে তুমি কি হারিয়ে গেলে।

হামিদার বাবার পরিচিতির সুবাদে এই চাকরিটা পেয়েছি। এখানে অফিসের

অন্যান্য কর্মচারীরা আমায় তাই একটু অন্য চোখ দেখে। কাজের ধকলে ক্লান্ত ছিলাম। কখন যে অফিসের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গিয়েছি খেয়াল নেই। শ্যামাপদ এসে পড়ে। আমার এ অবস্থা দেখে মনে মনে খুশি হয়। বড়কর্তার চোখে যাতে পড়ে যাই—মনে মনে এই প্রার্থনাই করে। আমি যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় হই ওর মঙ্গল। কর্তৃপক্ষের সরলতার সুযোগে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবে। কিছুক্ষণ পর নর্মদাবাবু এসে পড়েন। আমাকে এ অবস্থায় দেখে তিনিও অসন্তুষ্ট হন। আবার ভাবেন হয়তো আমার শরীর ভাল নেই। শ্যামাপদ খোঁচা দেবার সুযোগ ছাড়ে না। বলে, এমন প্রায়ই হয় নর্মদাবাবু, কত আর বলব।

নর্মদাবাবু আমার পিঠে হাত রাখতেই আচমকা জেগে উঠি। লজ্জায় ভয়ে শরীর ঘামতে শুরু করে।

কি শরীর খারাপ? তাহলে ছুটি নিয়ে ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে নিন।

ওঁকে বলি, আজ্ঞে না, তেমন কিছু হয়নি।

ইউনিয়নের লোকেরা ভাবে আমি মালিকের দালাল। সেদিন যখন বড়কর্তার ঘর থেকে বের হয়ে আসছিলাম, দেখছিলাম নর্মদাবাবু হাসিমুখে তাকিয়ে রয়েছেন। মনে হয়েছিল উনি বোধহয় বড় সাহেবের ব্যাপারটা আগে থেকেই জানতেন। অবশ্য ওঁর জানাটা স্বাভাবিক, কারণ কনফিডেনশিয়াল ফাইলটা তো ওঁরই হেফাজতে থাকে।

মাসের শেষে যখন বাড়তি এক গুচ্ছ টাকা পেয়েছিলাম, মনের খচখচ ভাবটা কেটেছিল। সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিলাম। অফিসে একটা সুন্দর প্রসন্নভাব ফিরে এসেছিল তারপর। মানিব্যাগের ভিতরে টাকাগুলো থেকে একটা সুরভিত মূর্ছনা ছড়িয়ে যাচ্ছিল আমার সমস্ত শরীরে। সুখানুভূতিতে চোখ বুজে আসছিল। বাড়ি ফেরার জন্য স্নায়ুগুলো সতেজ আর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। হামিদা অবাক হয়েছিল যখন বেতনের সব টাকাগুলো ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

সকালে নরম স্পর্শে হামিদার ঘুম ভাঙাই।

সুপ্রভাত ম্যাডাম। আপনার চা।

হামিদা মুগ্ধ চোখে আমাকে দ্যাখে। ওকে বলি, সকালবেলায় অনেকক্ষণ দেখেছি তোমার ঘুমন্ত শরীর। কী সুন্দর তুমি ঘুমোচ্ছিলে। তোমার যেন ঘুম না-ভাঙে পা টিপেটিপে উঠেছি। তারপর স্নান করেছি। চা তৈরি করেছি। তারপর এই তোমাকে ডেকে তুললাম।

হামিদা অফিস গেল। আমি ঘরেতেই কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছিলাম। দুপুরে ডাকে দেশ থেকে দাদার পাঠানো চিঠি এল। আমি নাকি বেলল্লাপনার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে গিয়েছি। মা-বাবা আর বংশের মুখে কালি লেপন করেছি। জাত ধর্ম খুইয়ে মুসলমান হয়েছি। মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছি। আমি যেন এ জন্মের মতো আর দেশমুখো না হই। চিঠিটা হাতে নিয়ে নিজের বুকের ধুকপুক আওয়াজ শুনি অনেকক্ষণ ধরে। চোখের সামনে আলোগুলো সব যেন ঝাপসা হয়ে নিভে যায়।

হামিদা বাড়ি ফিরে আমার অবস্থা দেখে ভিরমি খায়। বলে, আমার ওপর তোমার বুঝি আস্থা নেই? আমি আমার সর্বস্ব দিয়েছি তোমাকে। বলো, আর কী চাও তুমি?

বুকের ধুকপুক কাটে না। কমে।

বুঝতে পারি দাদা আমাকে গ্রামের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। দাদারও এখন পরিবার হয়েছে। সংসার বাড়বে এবার। কই আমি তো কখনও জানতে চাইনি—কোন জমিতে কত ধান হয়। আমায় যে টাকা তুমি পাঠাও তাতে কখনও মনে হয়নি আমার হকের টাকাই তুমি পাঠাচ্ছ। আমার মনে হতো তুমি দাদা, তুমি এটা করবে। আবার আমি যখন চাকরি করব, তখন আমারও দায়িত্ব থাকবে তোমার, বৌদির, ছেলে-মেয়েদের প্রতি। দাদা তুমি আমার সেই বন্ধন কেটে দিলে? তোমার একটুও কষ্ট হল না? সেই কবে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি—মনেও পড়ে না। এই জন্যই কি হস্টেলে পাঠিয়েছিলে? লোককে দেখিয়েছ—ভাইকে ভাল করে পড়াচ্ছ। আসলে তোমার মনে এই ছিল।

আচ্ছা তুমি তো আমার গ্রামে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিলে। বউদি কিচ্ছু বলল না? আচ্ছা কাঁদর পাড়ের জমিতে তুমি কি এবার আখ লাগিয়েছ? কলো গাইটার কি নতুন বাছুর হয়েছে? ডোবার পাড়ের জমিটায় সেবার কী সুন্দর বেগুন হয়েছিল তোমার মনে আছে? বুকের ভেতরে একটা ব্যথা ককিয়ে উঠতে চায়।

এইভাবে একটা ঘোরের মধ্যে চলতে থাকি। হামিদা বলে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও তো, সুলতানাদের বাড়ি যাব।

হামিদা বাথরুমে ঢোকে। ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে আসে কিছুক্ষণের মধ্যেই। বলে, কী এখনও রেডি হওনি?

এই হচ্ছি। আমার তো পাঁচ মিনিট।

বেশ তাই নাও।

কী হবে বলো তো ওখানে গিয়ে?

ওখানে যাব, খাব। বাঃ নেমন্তন্ন করে গেল, ভুলে গেছ?

তারপর?

তারপর বাড়ি চলে আসব।

তারপর?

অনুমান করো।

অনুমান করতে পারছি না।

চা খাবে?

না আমার চা তেষ্টা নেই।

আছে।

কী করে জানলে?

আমি জানি।

এর মধ্যেই আমাকে জেনে গেছ বলছ?

কিছুটা তো বটেই। কেন বুঝতে পারো না?

পারি, পারি। তুমি আমার চিরদিনের। চলো এবারে যাওয়া যাক।

সুলতানার মা আমাকে জামাই হিসাবে খাতির শুরু করলেন।

মাংস নিয়ে এলেন বড় বড় টুকরো।

এরকম আমি আগে কখনও খাইনি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, এ আবার কী জিনিস?

কালিয়া।

মাছের কালিয়া হয় জানতাম। মাংসের কালিয়া। খানিকটা অবাক হলাম। চেহারায় আমার রুচি চলে যায়। হামিদা আস্তে আস্তে বলে, খাসি তো।

মাথা নেড়ে বললাম, পছন্দ করি না, খেতে পারব না।

ও বিরক্ত হয়। জিজ্ঞাসা করে, তাহলে খাবে কী? মাছ দিতে বলব?

না। মাছ আমার ভাল লাগে না।

টেবিলে আর একটা পদ ছিল মাংসের। সেটা দেখে হামিদা বলে ফেলল, ও তুমি আবার খাবে না।

কেন?

তোমার ভাল লাগবে না।

বেশ লাগবে। ছোট ছোট টুকরো—আমাকে ওটা দিন।

চিরকাল হস্টেলে থেকেছে। ভাল করে খেয়েছে কোনদিন? সুলতানার মা আবহাওয়াটা হালকা করে দিলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর গল্পগুজব হচ্ছিল। সুলতানার দাদা আমায় নিয়ে ওদের বারান্দায় এলেন। নিজে সিগারেট ধরিয়ে আমাকে অফার করলেন। খাই না বলে ধন্যবাদ দিলাম।

ভাল না বেসে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যেতে পার তুমি? হঠাৎ সুলতানার দাদা প্রশ্ন করে আমায়।

হঠাৎ এ প্রশ্ন আমাকে? জিজ্ঞাসা করি।

উত্তর দাও। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে উনি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

আমার খুব খারাপ লাগল এই পরিবেশে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। বললাম, নির্ভর করে...

হ্যাঁ।

নির্ভর করে...

কীসের উপর?

পরিবেশ আর...

আর কী?

আবেগ।

অস্পষ্ট আমার উত্তর শুনে উনি না জানি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আমার ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে বললেন, ব্রেভো ইয়ং ম্যান। তোমায় আমি বিশ্বাস করলাম। তুমি সত্যি কথা বলেছ। কিন্তু হিন্দু মেয়েরাই তো বেশি সুন্দর। ওরা অনেক এগিয়ে। তোমার এ মতি হল কেন?

এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন আমার মাথায় আসেনি। এ নিয়ে আলোচনা করতেও কেমন একটু লজ্জা হল।

সুলতানার দাদা আমাকে 'দুলাভাই' সম্ভাষণ করলে আমি ওঁকে জড়িয়ে ধরি। উনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, এই যাঃ মুসলমানকে ছুঁয়ে ফেল্লে তো?

হো হো করে হেসে ফেলি। বলি, কী আর করব বলুন, জামাকাপড় ছেড়ে ফেলব।

তারপর বলি, জানেনই যদি আমি ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার করি। তাহলে জড়িয়ে ধরলেন কেন?

বড় ভাই হেসে আমায় জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে বলতে থাকেন, ওসব জানি না ভাই, তুমি এখন কী বল তো?

বললাম, আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ।

শাবাশ! এই তো চাই।

সবাই হেসে ওঠে। আমাদের হাসাহাসির মাঝে হামিদা এসে হাজির হয়। পরিহাস করে বলি, বড় ভাই ওকে আশীর্বাদ করুন, বলুন কয়েক গণ্ডা ছেলেপুলে হোক।

বড় ভাই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, দেখ ভাই আমি শুধু একটা কথাই বলব, তোমরা মানুষের মতো মানুষ হও।

মার হাব্বা! বলে সকলে বড় ভাই এর প্রশংসা করল। হামিদা দ্রুত কোথাও মুখ লুকলো। বড় ভাই এদেশে থাকেন না। কুয়েতে ওঁর ব্যবসা আছে। রেডিমেড গারমেন্টস এক্সপোর্ট করেন। এখানে এসেছেন দিন দশেক আগে। একবার বিয়ে হয়েছিল বলিউডের এক উঠতি নায়িকারা সঙ্গে, সে বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। নতুন করে আর বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।

হামিদার বন্ধু সুলতানা। ওরও বিয়ে হয়নি। ও উর্দুতে এম.এ. করেছে। চব্বিশ বছরের সুলতানা। শ্যামলা হলেও যার স্নিগ্ধশ্রী সহজেই চোখে পড়ে। ও কেন এখনও অবিবাহিত রয়ে গেছে এটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। জল্পনার সুতো টেনে নিতে নিতে অনেক বড় হয়ে যায়। তবে কি প্রেম ট্রেম কিছু আছে এর পিছনে? হামিদা বলে, মনে তো হয় না। হলে পর প্রেমিক পুঙ্গবকে ঘুরঘুর করতে কি দেখা যেত না? ও তো একা একাই যাতায়াত করে। শুনেও আশঙ্কাটা মন থেকে দূর করতে পারি না।

ছোটবেলায় দেখেছি স্কুলে চার-পাঁচ জন মুসলমান মেয়ে পড়ত আমাদের সঙ্গে। কলকাতায় দেখি বড় ঘরের মুসলমান মেয়েরা পড়ে নাম করা সব স্কুলে। গ্রামে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ঘরের মেয়েরা স্কুলে পড়ত আমাদেরই সঙ্গে। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ দেখেছি কেবল পানি আর জলের মধ্যে। স্কুলে আমরা সবাই চলায় বসায় একইভাবে বড় হয়েছিলাম। অবশ্য মুসলমান মেয়েদের বেশিরভাগেরই তেরো-চৌদ্দ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যেত। কেউ পড়ত না আর। তারপর তারা শ্বশুরবাড়িতে আর পড়বার সুযোগ পেত কি না জানতাম না। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে মুসলমান মেয়েরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে। তারা সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজেও যোগ দিচ্ছে। আগে কোনও দিন শোনা যেত না মুসলমান মেয়েরা হিন্দু ছেলেদের বিয়ে করেছে। এখন অনেক মুসলমান মেয়ের সঙ্গে হিন্দু ছেলের বিয়ে হচ্ছে। বিশেষত ডাক্তার, ব্যারিস্টার, উকিল, প্রফেসর প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের উচ্চমানসিকতার মুসলমান মেয়ের বিবাহ হচ্ছে হিন্দু ছেলেদের সাথে—এটা ঘটনা। মুসলমান সমাজে নারীরা এখন অনেক শিক্ষিত হয়েছে, উচ্চ-শিক্ষিতও হচ্ছে। কিন্তু আপামর মুসলমান নারীসমাজ শিক্ষার আলো তেমনভাবে পায়নি।

সুলতানা বলল, দুলাভাই এবার চা খাবেন তো? আপনার জন্য ভাল চা আনিয়ে রেখেছি।

আমি মাথা নাড়ি। বলি, চায়ে আমার আপত্তি নেই কখনও। তা সে খাবার আগে হোক বা পরে। আমার কাছে 'এভরি টাইম ইজ টি টাইম'।

সুলতানা হেসে বলে, আমি কিন্তু বেশি চা খাই না। রাতে ঘুম হয় না।

চায়ের পেয়ালা নিজের কাছে টেনে নিই। চুমুক দিয়ে বলি, আপনাদের সব কুশল তো?

ওই একরকম।

সে কী?

তারপর আমাদের কেমন লাগছে আপনার? অসুবিধা হচ্ছে না তো কোনও দিক থেকে?

হেসে বলি, না-না। আপনি মিছিমিছি চিন্তা করবেন না। নতুন নতুন এটা একটু হবে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি ঠিকই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারব।

সুলতানার মুখের অবসন্ন ভাবটা তবু দূর হল না। বলল, না-না। আপনি কেন খাপ খাইয়ে নেবেন। আমাদেরকেই খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়েছি। এখনও মানুষকে এসব শিখতে হবে?

উঠে দাঁড়াই। হেসে বলি, দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতেই তো সমঝোতা হয়। কেউ দু'পা এগিয়ে আসবে, কেউ এগিয়ে যাবে এক পা। সময়ই সব ঠিক করে নেবে দেখবেন।

সুলতানাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিই। চলে আসার সময় সুলতানা আমাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

আমিও নামজাদা বংশের সন্তান। সে সব কথা আমি এখন মনে রাখি না। সে কথা আমি কাউকে বড়াই করে বলি না। বরং পাছে কেউ চিনতে পারে বলে আমি চুপ করে থাকি। আমি যে অবস্থায় আছি তার সাথে যথাসাধ্য মানিয়ে চলবার চেষ্টা করছি।

বাবা-জ্যাঠারা জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। গ্রামে অনেক মুসলমানেরই বাস ছিল। শুধুমাত্র ধর্ম আলাদা বলে একে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করতে হবে এমন দুর্বুদ্ধি তাদের কখনও হতে দেখিনি। প্রাইমারি স্কুলেতেও ব্যাপারটা চোখে পড়েনি। হাইস্কুলেও না। তবে উপরের ক্লাসে উঠতে বুঝতে পেরেছিলাম তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। তারপর কলেজে এসে ব্যাপারটার নগ্ন চেহারা চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।

মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগত, গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো যার দ্বারা আক্রান্ত নয়, তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা কী করে এ বিষে জর্জরিত হয়। বারবার প্রশ্ন জাগত, একই মাটিতে জন্মে, অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, একই ভাষায় কথা বলে, একই ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কী এমন হল যার জন্য দেশটাকেও ছিঁড়ে দুটুকরো করতে হল? কোনও উত্তর খুঁজে পেতাম না।

পরে নিজের অভিজ্ঞতায় একটা ধারণা তৈরি করে নিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল

দুটি সম্প্রদায়ের অসম বিকাশ বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার জন্ম দিয়েছিল, যার পরিণতিতে দেশভাগের মতো বিপর্যয় ঘটেছিল। আধুনিক যুগের হিন্দু মুসলমানের অসম বিকাশের শিকড় প্রোথিত আছে মধ্যযুগেই।

হামিদার সঙ্গে গল্প করাতে হামিদা বলেছিল, তা হয়তো হবে। তুমি অনেক পড়াশোনা করেছ। তুমি ভাল বলতে পারবে। কিন্তু অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল তা জান?

না। হবে হয়তো বাংলাদেশে মুসলমানদের কারণে। আমি আমতা আমতা করি।

তা হলে তো দিল্লি বা লক্ষ্ণৌতে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত ছিল। কারণ ওখানে বাংলাদেশের থেকে অনেক বেশি দিন ধরে মুসলমান শাসন কায়েম ছিল।

তা হল না কেন? আমি জানতে চাই।

হামিদা বলে, এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে মধ্যযুগ পেরিয়ে প্রাচীন যুগে।

তখন কোনও মুসলমান বাংলায় ছিল না কি?

না। বাংলায় তখন কোনও মুসলমানই ছিল না।

সময় পেলেই আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করি। সহজ-সরল ভাবনার মধ্যেই আমাদের এসব মন্তব্য উঠে আসে।

সুলতানাদের বাড়ি ভাল করে খেতে না পারায় হামিদা অসন্তুষ্ট হয়েছে বুঝতে পারি। তাই ওকে বলি, কী আর করব বল? আমার নিজের মনে তো কোনও পাপ নেই। তবে বড় মাংসটা এখনও খেতে পারি না। বড্ড পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। কেমন যেন গা বমি বমি করে।

তোমাকে নিয়ে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে।

চেষ্টা করেছি তো খেতে। আসলে বেশি মাছ, মাংস খাওয়ার অভ্যেস নেই।

মাংস দেখলেই তোমার ওইসব কথা মনে পড়ে।

না-না। তা নয়। খেয়েছি তো না জেনে। জেনে খেতে পারি না।

চলতে চলতে হামিদা তার ইচ্ছের কথা বলে। বলে আমাকে আরও ভাল করে ডিটিপি শিখতে হবে। বালিগঞ্জের যে স্কুলে ও ডিটিপি শিখেছে, সেখানে আবার আমায় ভর্তি হতে হবে।

বাড়ি ঢুকে চা খেতে চাইলাম।

চা যদি না দিই অন্য কিছু যদি দিই? চায়ের তৃষ্ণা মিটবে তো? দেখো তো মেটে কি না!

হামিদা বুকেব আঁচল খসিয়ে মেঝেতে ছুড়ে দেয়। দুহাত বাড়িয়ে আমায় আহ্বান জানায়। ওর এই আহ্বানে সাড়া না দিই কী করে? এরপর দীর্ঘ গভীর চুম্বন ঠোঁটে, ঠোঁটের লাল চুষে খেতে থাকি। কেন কেবল ঠোঁটেই নয়, ঠোঁটের ওই লালেও আছে মধু। ঠোঁট থেকে ঠোঁট না সরিয়ে খুলে দিই ওর শরীরের সব আবরণ। খুলে ফেলি নিজেরও। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিই। হামিদা সরমে চোখ বোজে। চাদর টেনে দেয় নিজের শরীরে। মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলে দিই সেটি। হামিদা বুকের ওপর হাত

আড়াআড়ি রেখে ঢাকতে চায় ওর সব কিছু। হাত দুটো সরিয়ে দিই, মুগ্ধ চোখে দেখি হামিদার শরীর। আমার কণ্ঠ থরথর করে কাঁপতে থাকে। কল্পলোকের নায়িকার মতো মনে হয় হামিদাকে।

কী সুন্দর তুমি!

হামিদা পাশ ফিরে লুকোতে চায় নিজেকে। বলে, কী আছে আমার যে সুন্দর বলো তুমি?

তুমি জান না তোমার কী সম্পদ আছে। বলতে ইচ্ছে করে কী অপূর্ব রঙ তোমার, কী মসৃণ ত্বক, কী চমৎকার রঙ তোমার চুলের কী গভীর চোখ তোমার।

তুমি আমার মধু।

সত্যি?

সত্যি।

হামিদার বুকে পেটে তলপেটে চুম্বন করি। ও আমার মাথার চুলে বিলি কেটে দেয়। আমার পিঠে ওর হাত। পিঠ থেকে গালে, তারপর ঠোঁট, চিবুক, কপাল, চোখের ভুরু, বোজা চোখের পাতায় ওর আঙুল ঘুরে বেড়ায়। ওর শিখর বৃন্ত দুটো জিভের জলে ভিজিয়ে দিই। ঘুমিয়ে থাকা লালচে বৃন্ত দুটো জাগতে থাকে। আমার ঠোঁট নেমে আসে জেগে ওঠা ওই বৃন্তে। আলতো করে চুমু খাই।

ওর বুক থেকে পেটে চুমু খেতে খেতে নেমে যাই নিচের দিকে। আমার জিভের জলে, মুখের লালার জল উপচে পড়ে। জলে ভেজা ঠোঁট থেকে জল শুষে নিতে থাকি। অন্ধ উন্মাদের মতো জল সেচন করতে থাকি, এমনই তৃষ্ণার্ত যেন আমি। লজ্জায় হামিদা চোখ বোজে।

ওকে বলি, চোখ খোল হামি। এ তো আমার একার আনন্দ নয়, এ তো আমাদের দুজনের আনন্দ। চোখ খোলো। দুহাতে ভর রেখে শরীরকে তুলে রাখি ওর বুকের ওপর। তীব্র এক তৃষ্ণা হামিদাকে কামড়াতে থাকে। আমায় দুহাতে আঁকড়ে ধরে। আমার পিঠের ওপর ওর কাঁকনের চাপ ক্রমশ আমায় সুখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

তপন আমার তপন।

বলো।

লাজে রক্তিম হয় হামিদা।

তপন, তপন!

হামিদা ডাকে। এ যেন অতল জলের আহ্বান। শুশুকের মতো বারবার জলে ডুব দিই। আবার মাথা তুলি। দুজনের শরীরে উথাল-পাথাল সুখ ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের ফেনার মতো।

চিত হয়ে শোওয়া হামিদাকে কোলের ওপর বসিয়ে নিই। টেনে আনি নিজের কাছে। মধুর নেশায় মাতাল হই। সমুদ্রের ঢেউ আবার আছাড় খায়। পুরো গা ভিজিয়ে স্নান করি দুজনে। হাঁপাতে থাকে হামিদা। দুজনে দুজনের গভীরে প্রোথিত হয়ে শুয়ে থাকি অনেকক্ষণ।

এই ভাবে রাত গভীর হয়। তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠি, গলা শুকিয়ে কাঠ। গড়িয়ে জল

ঢালি, জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাই। হামিদাও উঠে বসে। জল খায়, হাসে। ওর এই হাসি ওকে করে তোলে আরও রমণীয়।

আবার ওকে আদর করি। চঞ্চল করে তুলি। হাঁসফাঁস করে হামিদা। যেন জলে ডুবে যাবে এবার। ঝড়ের বেগ যখন বাড়ে, হামিদার শরীর শূন্যে উঠে আসে। ওর শীৎকারে ঘর দোলে। সব কিছু তছনছ করে দেয়। দুকূল ছাপিয়ে হামিদার ভুবন ভেসে যায়। সুখে কাঁপতে থাকা আমার ঘর্মাক্ত বুকের ওপর নিজের শরীর ছড়িয়ে দেয় হামিদা।

ভালবাসা এত তীব্র এর আগে কখনও অনুভব করিনি।

হামিদা থরথর কণ্ঠে বলে, তপন, আমার তপন। কোথায় ছিলে এতদিন? কেন আরও আগে আমাদের দেখা হয়নি।

আলতো চুমু খাই ওর ঠোঁটে।

ওর কানের কাছে মুখ রেখে বলি, হামি আমার হামি।

আলো-আঁধারির ঘরটিতে হামিদাকে মনে হয় যেন কোনও রাজকন্যা। ওর সারা শরীরে অদ্ভুত এক প্রশান্তি, হৃদয়ে সুখ নিয়ে ও শুয়ে থাকে।

ওর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করি, এই ঘুমোলে নাকি?

না।

আরও একবার খেলবে নাকি?

কবার হল?

বাঁ হাতের ওপর মাথা রেখে ডান হাতে আমার প্রিয় কদমফুল নিয়ে খেলা করি। বলি, তুমি আমায় মাতাল করে দিয়েছ হামি। কী যে জিনিস আছে তোমার ভেতরে, প্রতিবারই যেন প্রথম মনে হয়। যত দেখি তত নতুন লাগে। যত তৃষ্ণা মেটাই, তৃষ্ণা আরও বেড়ে যায়। তুমি যখন আমার পিঠ...

থাক আর বর্ণনা দিতে হবে না। এসো।

ভোরের মায়াবী আলোয় ডুবে ডুবে দুজনে অমৃতসুধা পান করি আরও একবার। হামিদার ভাল লাগে। সমুদ্রে ঝড় ওঠে আবার, সাদা ফেনার তলে ডুবে থাকে ওর শরীর ; কদমফুল কেবল উঁকি দেয়। ওদিকে আমি হাত বাড়াই। কদমফুল ডুবে যায় ফেনার তলে। লুকোচুরি খেলা চলে জিভের সঙ্গে ঠোঁটের, ঠোঁটের সঙ্গে কদমফুলের ; যতক্ষণ না শ্বাস ঘন হতে থাকে দুজনের। ওর পা দুটো জলের ভেতর থেকে তুলে আনি, খুঁজতে থাকি ওর অতল সরোবর। বলি, এসো আজই আমরা রোপণ করি আমাদের ভালবাসার স্বপ্ন।

আমার কথায় হামিদার শরীরে ভরা কোটালের জোয়ার আসে। তীব্র এক তৃষ্ণা ওকে দংশন করে। আমার শরীরে জেগে ওঠে আর এক শরীর। আক্রোশে যেন সে ফুঁসতে থাকে। হামিদা আমার পিঠ খামচে ধরে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে।

কী চাও বলো। ছেলে না মেয়ে? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি ওকে।

ও বলে, ছেলে।

আমি বলি, মেয়ে।

তাহলে দুটোই এক সাথে। বলি আমি।

খিলখিল হাসিতে ভোরের ঘন অন্ধকারের ঊষালগ্নে হামিদার শরীরে রোপণ করি আমাদের স্বপ্নের বীজ। হামিদা আর্তনাদ করে ওঠে, ওঃ তপন!

ধনুকের মতো বেঁকে যায় ওর মসৃণ শরীর। ওর মুখে অদ্ভুত সুন্দর আলো পড়ে। এত গভীর সেই আলো আমি দেখিনি এর আগে। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপে। আমায় জড়িয়ে ধরে হামিদা। অন্ধকার কেটে তখন ঊষার প্রথম আলো এসে আছড়ে পরে আমাদের গায়।

সুলতানা ব্যাপারটা হালকাভাবে ছেড়ে দিয়েছে বলে মনে হল না। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আবার এসে হাজির হামিদার কাছে। খোঁজ নেয় কাছেপিঠে যারা আছে তাদের মধ্যে কে কে আসে।

এ বাড়িতে আবদুল মিঞার গুরুত্ব এখন কমে গিয়েছে। এতদিন তিনি মোতি সাহেবের বন্ধু হিসাবে বাড়ির অভিভাবকের মর্যাদা পেয়েছেন। আমার সঙ্গে কয়েকবার কথাও হয়েছে তাঁর। হামিদা তার কিছু কিছু শুনেছে। হামিদার কী সন্দেহ জানি না। ও ওঁকে খুব একটা বিশ্বাস করে না আর। উনি এলেই হামিদা আমাকে আড়াল করে রাখে। হয় অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেয়, নয়তো বাজারের থলে হাতে ধরিয়ে দেয়। তারপর ওঁর সাথে কথা বলে এমনভাবে যেন ওঁর ওপর কোনও ক্ষোভ নেই, কোনও অভিযোগ নেই। আমি থাকতে চাইলেও হামিদা থাকতে দেয় না। পার্থক্যের বাহ্য-ব্যবহার রীতির স্থূল-স্বাতন্ত্র্য বিধানটা আমার নিতান্তই বাহিরের লৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়। অন্ধ পার্থক্যের গোঁড়ামি মানুষের মর্ম পীড়িত করে। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে আমার মনে হয় এই ক্ষুদ্র কার্পণ্যই একটা বৃহৎ বিরোধের সৃষ্টি করে দেয়। তাই অন্ধ বিশ্বাসে আঘাত লাগলেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সঙ্কীর্ণতা তখন সঙ্কীর্ণতম হয়ে যায়। বাজারের থলি হাতে হাঁটতে হাঁটতে এই সব চিন্তাই আমার মনকে পীড়িত করে।

বুঝতে পারি অন্তরের ঔদার্যে হামিদা নীরব সহানুভূতিতে সব কিছু হাসি মুখে এড়িয়ে চলে। বুঝতে পারি দুর্বল অসহিষ্ণুতায় রুক্ষ ঔদ্ধত্যে কারও অন্তরে আঘাত করা ওর স্বভাবে নেই। এই সহৃদয়তার গুণেই হামিদা সকলের অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত সুহৃদ।

সেদিন কাজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ আমাকে সামনে দেখে আবদুল মিঞা খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জোরে জোরে পা ফেলে কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, বাসায় ফিরছ বুঝি?

ওঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে একটু বেশি হেসে বলি, ও আপনি। হ্যাঁ বাসায় ফিরছি। মিঞা সাহেব বলে ওঠেন, তোমার দেশ তো কান্দীতে?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

না। ওদিকে একটু কাজ পড়েছে। যাব এই আর কি।

ও তাহলে খোঁজ-খবরটা ভাল করে নিয়ে আসবেন তাই তো? কথাটা বেশ আহত স্বরেই বলে ফেললাম।

আবদুল মিঞা একটু হকচকিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বাধা দেবার মতো করে বলে উঠলেন, না, না, সে রকম কিছু মনে করে বলছি না বাবা। আমরা তো জানি বাপজান তুমি আমাদের আত্মীয়র মতো। খারাপ কিছু ভাবিনে তো তোমার সম্বন্ধে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে যায়। রাস্তায় ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে বলি, আপনি হয়তো ভাবেন না। কিন্তু সবাই না হলেও কেউ কেউ কি আর ভাবছে না?

মাথা নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো করে মিঞা সাহেব বলেন, তুমি শুনেছ নিজে অমন কিছু?

না শুনিনি। তবে অনেকের চোখের দৃষ্টিই বলে দেয় তারা কী ভাবছে। জানেন, আমার খুব খারাপ লাগে মাঝে মাঝে।

খুবই উদ্বিগ্ন স্বরে মিঞা সাহেব বলে ওঠেন, কেন? কেন?

বারে, আপনারা সবাই কেমন সন্দেহের চোখে দেখেন আমাকে। ভাবেন মুসলমানের মেয়ে বিয়ে করেছি, এখন হয়তো আরও দুরভিসন্ধি পুষছি মনে মনে।

একটু থেমে নিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলি, অবশ্য হামিদা আমাকে ভালবাসে, ওর ভালবাসাকে অস্বীকার করতে পারব না। আমার চেয়ে আরও হয়তো যোগ্য ছেলে ছিল আপনাদের মধ্যে। এর জন্য আমকে ওর ওপর সারাজীবনই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। তারপর মিঞা সাহেবের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললাম, জানেনই তো কৃতজ্ঞতাবোধ খুব কষ্টের।

মিঞা সাহেব চুপ করে থাকলেন। সামনের দিকে তাকিয়ে বলি, বাড়ির কাছে চলে এসেছি, আসুন এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।

মিঞা সাহেব চারদিকে দেখে নিয়ে বললেন, না চা এখন খাব না। তোমার আপত্তি না থাকলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলতে পারি।

লজ্জিত হয়েই বললাম, না আপত্তি থাকবে কেন? তবে সেটা কি শোভন হবে? আর তা ছাড়া আপনার বাসায় ফিরতে কি দেরি হয়ে যাবে না?

না। আর দেরি হলেই বা কী? সেই তো ফিরে গিয়ে থোড় বড়িখাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়। এটা নেই, সেটা নেই। বাজার থেকে কিনে আনলাম না কেন? রেশন আনা হয়নি, এসবই তো গিয়ে শুনতে হবে।

হাসলাম, বললাম, আপনার স্ত্রী বুঝি খুব সংসারী। মানে সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছুই বলেন না?

মিঞা সাহেবের ভ্রূ কুঁচকালো। তারপর হেসে বললেন, স্ত্রী আসবে কোত্থেকে? সে তো মাটির তলায় ঘুমোচ্ছে এখন। বুড়ো বাবা-মার কথা বলছি। ছোট ছেলে মেয়েগুলোর কথা বলছি। অবশ্য স্ত্রী থাকলেও ব্যাপারটা অন্যরকম হতো বলে মনে হয় না।

বিব্রত হয়ে বলি, সরি। না জেনে বলে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করবেন।

দুর বোকা! হো হো করে হাসলেন মিঞা সাহেব। বললেন, কথায় বলে ভাগ্যবানের বউ মরে, আমি হচ্ছি সেই ভাগ্যবান।

আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কোনও কথা আসছিল না মুখে। মনে পড়ল একবার ডাক্তারখানা যেতে হবে।

হামিদার পেটের ব্যথাটা গত কয়েকদিনে কমেনি একটুও। মিঞা সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাই জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলাম।

পথ চলা যেন আমার শেষ হয় না। কেবল হাঁটি, কেবলই হাঁটি। হাঁটতেই থাকি।

গুঞ্জনটা কিছুদিন আটকে থাকল। চোখের দৃষ্টিগুলো বিঁধতে থাকল অব্যর্থ তীরের মতো। টুকরো কথা, চাপা হাসির গা শিউরে দেওয়া ঢেউ আমাকে একের পর এক চমকে দিল। দুঃখে অপমানে আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। বেশ রাগ হল আবদুল মিঞার ওপর। তিনি কেন যে এমন করলেন!

আবদুল মিঞার সঙ্গে হাসনাত, জব্বার আর অন্যান্যদের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে। আবদুল মিঞা যতই আমাকে ডিফেন্ড করতে চেয়েছেন, ওরা ততই খেপে গিয়েছে। বিদ্রূপ ভরা কথাগুলো ওঁকে বলা হলেও আমার কানে পৌঁছবার মতো করেই বলা হল।

শেষে আর থাকতে না পেরে আবদুল মিঞা বলে ফেললেন, ছি, ছি! তোমরা এমন ভাবতে পারো কী করে? আমি তো যতটুকু জেনেছি, হামিদা বেগমের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক হতেই পারে না বড়কর্তার। জানাশোনা ছিল, হামিদা অনুরোধ করেছিল, তাই তপনবাবুকে ওরা চাকরি দিয়েছেন।

কিন্তু সেটাই সব নয়। জব্বার ভ্রু কুঁচকে বিশ্রী একটা শব্দ করে বলে, তাই বলে বছর যেতে না যেতে ইনক্রিমেন্ট? ব্যাপারটা কী মিঞা? আমরা কি বুঝিনে? অন্য কিছু না হোক, স্বজনপোষণ তো বটেই। তা হলে?

আবদুল মিঞা রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, কই তুই যখন ইনক্রিমেন্ট পেলি দশ মাস যেতে না যেতে, তখন তো এমন তুফান তোলেনি কেউ?

হাসনাত খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলে, বুঝেছি। দু-চারদিন কথাবার্তা বলেই তোমার মাথাটা ওই বড়কর্তার মতো চিবিয়ে খেয়েছে। মেয়েরা পারেও।

আবদুল মিঞা মুখ চোখ লাল করে বলে উঠলেন, শাটআপ।

শাট্আপ! হাসনাতও খিঁচিয়ে উঠল। বলল, দেখে নেব আমাদেরও স্ট্রাইক আরম্ভ হচ্ছে। তখন কোনদিকে থাকে তোমার ওই আদরের দুলাভাই!

খুক খুক করে কাশি। হামিদা সতর্ক করে। বলে, ঠাণ্ডা লাগিয়েছ। মাফলারটা বার করে দেব?

বিছানায় একটু বেশি এপাশ ওপাশ করি। সকালে হামিদা বলে, তোমার কি শরীর খারাপ? রাতে সারাক্ষণ এপাশ ওপাশ করেছ! তোমার কি ঘুম আসে না?

ঘুম তো মাঝে মাঝে আসে না। শরীরে কী যে হয়, মাঝে মাঝে অস্থিরতা বেড়ে যায়। শুলে ঘুম আসে না। জল তেষ্টা পায়। ঘাম হয় শরীরে। জলের গ্লাস, ঢাকনা, জগ সবই তো শিয়রের কাছে রাখা থাকে। বিছানা থেকে উঠলে, বারবার বাথরুম গেলে, হামিদা টের পাবে—এতো রাতে আমি জেগে আছি। তাই মটকা মেরে শুয়ে থাকি।

মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে দেখতে পাই জলের অতলে ডুবে যাচ্ছি। আত্মরক্ষার জন্য চিৎকার করতে চাই বাঁচাও, বাঁচাও। অথচ পারি না। গোঁ গোঁ আওয়াজ ওঠে মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে টের পাই, হামিদা আমাকে ঠেলছে।

এই, এই! আবার বুকে হাত রেখে শুয়েছ? এই কী হয়েছে? এমন করছ কেন? তোমাকে এত করে বলি চিত হয়ে শোবে না, বুকের ওপর হাত রেখে শোবে না, বুকে হাত রেখে শুলে ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরে।

লজ্জা পাই। কিছু বলতে পারি না। চুপচাপ পাশ ফিরে শুই।

এমনি করে দিন গড়িয়ে সন্ধে হয়। সন্ধে গড়িয়ে রাত। রাত গড়িয়ে আসে নতুন সকাল।

কিন্তু তবু অন্যদিনের সকালের চেয়ে আজকের সকালের যেন অনেক তফাত মনে হয়। আজ পাখিদের চিৎকার কম। সবাই যেন সন্ত্রস্ত। সচকিত।

হামিদা শুয়ে আছে। পেটে ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করছে কী?

না। দেখ তো কে এসব করে?

তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আজ আমি কোথাও বেরুব না।

না না। তোমার এসময় কামাই করা উচিত হবে না—নতুন চাকরি। আমি রইলাম পড়ে। সাবিত্রী ছুটি নেবার আর সময় পেল না!

এক কাজ করি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ওদের বলে চলে আসি। আমি বললাম। যাব আর আসব। দুজন লোকের খাওয়া, অত ব্যস্ত হয়ো না। আমি এসে করে নেব।

বারে, দুজন লোক বলেই তো ভাল করে রান্না বান্না করা দরকার।

দ্যাখো রান্না বান্না কোনও দিন করিনি বটে। তবে ভাত করে নিতে পারব। আলু সিদ্ধ আর ডিম ভাজা। কী বলো? আচার তো রয়েছেই।

হামিদার জন্য মুসাম্বি ছাড়িয়ে দিই। গুঁড়ো সাবান দিয়ে কাপড় কেচে শুকোতে দিই উঠোনের দড়িতে। ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করি ঘরগুলো।

কাজের জায়গায় দেখা করেই ফিরতে চাই। ফেরার পথে বাজারটা সেরে নেব এই ভাবনা। বাড়ি এসে ডিটিপি'র কাজগুলো নিয়ে কম্পিউটারে বসব। দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছে। কাজ করা হচ্ছে না, কাজ জমে যাচ্ছে।

কিন্তু অফিসে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি না। হাতে একটা আর্জেন্ট কাজ দিয়ে দেয়। কাজটা মোটা টাকার তাই অস্বীকার করতে পারি না। খানিকটা করে দিই, বাকিটা পরের দিন বাড়ি থেকে করে নিয়ে গিয়ে দেব বলে ছাড়া পাই। বাজার করা হয় না। বাড়িতে এসে কম্পিউটারে বসি। সন্ধে হয়ে যায়। হামিদা কম্পিউটার থেকে উঠতে বলে। আমার উঠতে ইচ্ছে করে না। কাজটা শেষ করতে চাই। বলি, এখনও তো রাত বেশি হয়নি, আর একটু কাজ করি।

হামিদা বলে, তা হোক, বেশি রাত করো না। তোমার শরীরও ভাল নেই।

আজকাল তো একটু বেশি ভাল আছি।

কই ভাল আছো, দিন দিন চেহারা কী হচ্ছে দেখছো, আয়নাতে চেহারাটা ভাল করে দেখো একবার।

আর বাক্যব্যয় না করে উঠে পড়ি।

হামিদা কেমন অন্যমনস্ক। মুখ দেখে বোঝা যায় কিছু একটা চিন্তা করছে। হঠাৎ ডাকে—শুনছো—

তাড়াতাড়ি ছুটে আসি, ডাকছিলে?

রাত হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।

হেসে উঠি, রাত কোথায়? সবে ন'টা বেজেছে।

ও! তাহলেও খেয়ে নাও।

এসো আমার সঙ্গে। ওকে ধরে চেয়ারে বসাই।

তুমি এত অধীর হচ্ছ কেন বলতো? এই কাপড়টা ধরো।

শুকনো কাপড় জামাগুলো গুছিয়ে রাখি। খাবার গরম করি। আমার কাজের ধরন ধারণ দেখে হামিদা বলে, তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি।

হ্যাঁ। আমার তো কষ্টের কপাল। নইলে তোমার মতো স্ত্রী পাই! বলে হো হো করে হেসে উঠি।

হামিদা কিন্তু হাসে না। বলে, এমন ধারা কথা তো মনে আসা ভাল নয়।

তুমি তা হলে অমন কথা কেন বল বারবার!

মন যে বোঝে না।

মন কে বশ করতে শেখাও। ভাল হবে তাতে।

আমার ভাল হয়ে আর দরকার নেই, আর এছাড়া এ সংসারে সকলেরই যদি ভাল হয় তো খারাপ হবে কার?

খারাপ বুঝি কারও না কারও হতেই হবে? আর তুমি সেই দলে?

ঠিকই তো।

তাহলে আমাকে বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ বল?

হামিদা কোনও কথা বলে না। চুপ করে থাকে। বলি, এমন পাগলামি করলে কি সংসারে বেঁচে থাকা চলে? দুঃখ সইতে হবে, কষ্ট করতে হবে, তবেই তো জীবন। জীবন সুন্দর বটে, কিন্তু জীবন তো আবার নিষ্ঠুরও। এত অল্পে মন-খারাপ করলে কী চলে? পৃথা কি আত্মহত্যা করে খুব ভাল কাজ করেছে বলে তুমি মনে কর?

কি জানি! ভালবাসা বোধহয় এক একজনের কাছে এক এক রকম চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়!

কিন্তু তোমার কথা! ওই যাঃ, তরকারি চাপিয়ে এসেছি ওভেনে।

ছুটে যাই রান্নাঘরে। হামিদা বলে, কড়ায় জল আছে কি না দ্যাখো। জল শুকিয়ে গিয়ে থাকে তো একটু জল দিয়ে দাও।

এইভাবে ঘরে-বাইরে সামাল দেবার চেষ্টা করে যাই। কিন্তু সামাল দিতে পারি না। কম্পিউটারে কাজ করতে করতে মাঝে মধ্যে চেয়ে ফেলি, এক গেলাস জল দেবে?

জলটুকুও গড়িয়ে খেতে পার না?

বুঝতে পারি ভুল করে ফেলেছি। উঠে যাই জল ঢালতে ততক্ষণে হামিদা জল নিয়ে এসেছে। টেবিলের ওপরে গেলাসটা ঠকাস করে রেখে বলে, এই নাও।

জল খাই। গেলাস তুলে রেখে আসি। আবার হয়তো ভুল করে জল চেয়ে বসব তাই বোতল ভর্তি জল নিয়ে বসি।

টিভিতে এখন ছায়াছবির গান হচ্ছে। সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ছিল ঝুলনা। এই গান একদিন গেয়েছিলাম আমরা দুজনে একসাথে।

হামিদা শোনো! হামিদা কি আমার ডাক শুনতে পায় না! না সে শুনতে পায়, অথচ সাড়া দিতে পারে না। ওর ভিতরে এক কুসুম কলি ফুটে উঠছে যে, তা ও টের পেয়েছে। ডাকলেই তাই আর কাছে ছুটে আসা হয় না, এমনি সংকোচ এখন ওকে ঘিরে ধরে। দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে বলে, যখন তখন ডাকবে না। তুমি শুনছ, শোনো না! আমাকে ডাকাডাকি কেন? আমার এখন সময় নেই গান শোনার।

হামিদাকে বোঝাতে পারি না যে ওর পাশে বসে গানটা শুনলে মানেটা একরকম হয়, না শুনলে অন্যরকম। কখন কীভাবে যে কোনও গান জীবনকে আশ্চর্যভাবে মুখর করে তোলে কে বুঝতে পারে? যে শোনে। চারপাশে তখন মনে হয় জীবন কত মধুর। এক অপার সৌন্দর্য খেলা করে বেড়ায় তখন চারদিকে। এরই নাম বোধহয় জীবনের সুষমা। যা অতর্কিতে আসে, আবার গভীর এক রহস্যালোকে হারিয়ে যায়।

চৈত্র মাস শেষ হতে চলেছে। প্রকৃতিতে রুক্ষ জড়তার আবরণ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। একটা স্নিগ্ধ সবুজ উল্লাস চারদিকে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে। শুক্লা নবমীর সন্ধ্যা-জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে চরাচরে।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দায় পায়চারি করি। এমনি রোজই করি। আহারের পরই নিদ্রা আমার অভ্যাস নয়। পাশাপাশি বাড়িগুলো থেকে লোকজনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। হামিদা শোবার ঘরে টিভি দেখছে! স্তব্ধ বিস্ময়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাঁদ হাসছে। এই হাসিকেই বোধহয় বলে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।

আজ যদি এই ঘর-সংসারের দায়িত্ব না থাকত তাহলে কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। কিন্তু আজ আর তা পারি না। সংসারের ঝঞ্ঝাট রকমারি হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে আমায়। শেকল ছেঁড়া মানুষ আজ আর তাই আমি হতে পারব না। জীবন এক ভারবাহী পশুর মতো আমার পিঠে চড়ে বসেছে। এই ভার যতক্ষণ আমার পিঠে থাকবে ততক্ষণ আমায় চলতে হবে। দিন কেটে যায়। এই ভাবে রাতও কাটে।

চায়ের কাপ হাতে সাবিত্রী এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করি, কি কিছু বলবে?

হ্যাঁ। নখ খুঁটে ঘাড় গুঁজে জবাব দেয় সাবিত্রী। বুঝতে পারি টাকা-পয়সা কিছু চাইবে।

বল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি।

আমার বর...

তোমার বর কোথায়?

সাবিত্রী কিছুক্ষণ কোনও উত্তর দেয় না। তারপর কথা বলে। ওর গলা কাঁপে। আমার বরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

কেন?

আমার কাছে তো থাকত না। বে-পাড়ায় একটা মেয়ের সঙ্গে থাকত। আমার ওপর থেকে তার সব দায় তার উবে গেছে। আমি জানি না কেন এমন হল। কাল রাতে সেই মেয়েটার ঘর থেকে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে।

তা ভালই তো। ওর একটু শিক্ষা হোক।

না জামাইবাবু। হাজার হোক স্বামী তো। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

পুলিশে আজকাল থানায় এমন মার মারছে যে মানুষ থানাতেই মরে যাচ্ছে।

অমন স্বামীর জন্য এখনও তোমার পীরিত আছে দেখছি।

সাবিত্রীর চোখে জল টলটল করে। চোখের কোণ বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে। ওকে অচেনা মনে হয়। এই জন্যেই বোধহয় বলে মেয়ে মানুষের মন। এটা দয়া না প্রেম কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। বলি, তা আমি কী করব?

আপনি ওকে একটু ছাড়াবার ব্যবস্থা করে দিন।

কী কেস কিছুই তো জানি না। তা ছাড়া ছাড়িয়ে নিয়ে এলে তো ও ফের সেই মেয়েটার কাছেই যাবে। তোমার লাভ কী?

খুব ক্ষীণ একটা কাঁপুনি সাবিত্রীর সমস্ত শরীর বেয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নামে। ওটা যে কান্নার চাপা আবেগ ওকে দুমড়ে মুচড়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তুলছে বুঝতে পারি। ও বলে, তা হোক জামাইবাবু আপনি ওকে ছাড়িয়ে আনুন।

জীবনের ঘৃণিত পঙ্কিল অন্ধকার থেকে মনে হল এক পবিত্র আলো যেন উঠে এল এই সকালে। মনে মনে বললাম, এরই নাম বোধহয় প্রেম।

থানা পুলিশ আর উকিল শুরু হল আমার দৌড়। সমাজের এই সব আধো অন্ধকার গলি-ঘুঁজিগুলো সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। সাধ্যমতো প্রচেষ্টার মধ্যেই জামিনে মুক্ত হল সাবিত্রীর প্রেমিক স্বামী। মাথা নিচু করে সুবোধ বালকের মতো আমায় প্রণাম করে গেল—বলে গেল আর কোনও দিন ও আর এমন করবে না। আমার কিছু অর্থদণ্ড গেল বটে কাজটা করে খুশি হলাম। হামিদাও খুব খুশি হল। সংসারের সবাইকে যদি এভাবে খুশি করা যেত কত না ভাল হতো।

বাজারে যাচ্ছিলাম। দেখি সপ্তাহান্তিকের ছুটিতে মোতি সাহেব বাড়ি এলেন। বাড়ি এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে দেখলেন, ওষুধ দিলেন। কিন্তু কোনও উন্নতি হল না। এক সপ্তাহ হয়ে গেল মোতি সাহেব অসুস্থ। ডাক্তার এতদিনে আবিষ্কার করলেন এটা মাইল্ড স্ট্রোক ছিল। রোগীকে হাসপাতালে অথবা নার্সিং হোমে ভর্তি করা উচিত ছিল। মোতি সাহেব এখন বাড়িতেই আছেন। দুবেলা ডাক্তারবাবু দেখে যান।

আমার কেমন ভয় হয়। হামিদার শরীর ভাল নেই। এই সময়ে উনি আবার অসুস্থ হলেন।

মোতি সাহেব বসবার ঘরে চটি পায়ে পায়জামা পরে চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিলেন। আজকাল উনি আর বাইরে বের হতে পারেন না। হামিদা ঘরে ঢোকে। মোতি সাহেব হামিদার দিকে চেয়ে বললেন, কই আজ তোরা বাইরে গেলি না?

হামিদা অপ্রসন্নমুখে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, না।

মোতি সাহেব পাশের চেয়ারটা টেনে সামনে রেখে হামিদাকে বসতে বললেন, আয়, বস মা বস।

হামিদা নম্রভাবেই আসন গ্রহণ করে।

ওকে লক্ষ্য করি। হামিদা উদাসীনভাবে টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে দাঁতে নখ খোঁটে। মোতি সাহেব ওর অস্থিরতা বুঝতে পারেন। তাই হালকা কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

কিন্তু হামিদার পক্ষ থেকে সেরকম সাড়া না পাওয়ায় তিনি আবার কাগজে মন দিলেন।

তোমাকেই সব ভার নিতে হবে তপন।

অসুস্থ অবস্থায় মোতি সাহেব আজকাল আমায় কেবল এই কথাই বোঝান। কিন্তু হামিদা কেমন একরোখা আর জেদি হয়ে উঠছে। যে বুঝতে চায় না, তাকে বোঝানো বড় বিপদ। আমি তাই এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলি। আজকাল কথাবার্তা আমাদের খুব কমে গেছে। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারি না। মোতি সাহেব মনে বড় কষ্ট পান। ওঁর অবস্থা বুঝতে পারি। মানুষটা ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছে।

হামিদাকে বলছি ছুটি নিতে কিন্তু ও কিছুতেই ছুটি নিতে চাইছে না। এর মধ্যেই যাতায়াত করে ডিউটি করছে।.

ট্রেনে আজকাল আর আমরা একসাথে ফিরি না। আলাদা আলাদা ফিরি। অনেক সময়ই একই ট্রেনে আলাদা আলাদা আসা হয়। বহডুর প্ল্যাটফর্মে দেখা হয় আমাদের অথবা বাড়ির পথে বাড়ির সামনে। ট্রেনে ফিরতে ফিরতে এসব কথাই ভাবি। হামিদা নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে।

বাড়ির সামনের রাস্তাটা অন্ধকার অন্ধকার। দূর থেকে ভাল দেখা যায় না। তবু কিছু দূরে হেঁটে গিয়ে মনে হল যেন কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে হামিদাদের বাড়ির সামনে।

হ্যাঁ। ওইটেই তো হামিদাদের বাড়ি। বিয়ের দিন ওই বাড়িতেই কত ভিড় হয়েছিল। আজ আবার সেই বাড়িটার সামনেই ভিড়ে ভিড়। আজ আবার ওখানে কী হল!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যাই।

ভিড়ের ঠেলায় ভেতরের কিছু দেখা যায় না। নজরে পড়ল কাজের বউ সাবিত্রীকে। চোখ দুটো ছলছল করছে। কাঁদো কাঁদো মুখ। কী হল এ বাড়িতে। তবে কী?

দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরের ভেতরে একটা থমথমে ভাব। ঢুকতেই নাকে যেন ওষুধের গন্ধ পেলাম। তীব্র একটা গন্ধ। বসার ঘরের ভেতরে অনেকে বসে আছেন। বেশির ভাগের মুখে দাড়ি। সবাই বেশি বয়সের মানুষ। চুপি চুপি গলা নিচু স্বরে কথা বলছেন। আবদুল মিঞাকে দেখলাম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন।

শোবার ঘরে হামিদা বসে আছে মোতি সাহেবের বিছানার পাশে। মাথার দিকে। বড় বেশি উদ্বিগ্ন। ডাক্তারবাবু ঘরে এলেন। মোতি সাহেবের নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। মোতি সাহেব চিত হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। চোখ দুটো বোজা। শান্ত সমাহিত যেন এক পার্থিব শরীর।

টিপি টিপি পায়ে হামিদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হামিদা একবার মুখ তুলে চাইল। আশেপাশে যারা ছিল তারাও একবার করে দেখে নিল আমায়। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না করো মুখ থেকে।

মৃত্যু!

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় আমার আছে। কারণ খুব স্পষ্ট করে মৃত্যুকে দেখেছি তাই একবার দেখলে আর চিনতে ভুল হয় না। প্রথমে অন্ধকারের আবহাওয়ায় কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা আলোড়ন শুরু হয়। তারপর অন্ধকার ঘন হয়ে আশে। সেই অন্ধকারে প্রত্যক্ষ হয় তার চেহারা। খুব সতর্ক পায়ে সে নামে। সব কিছু চেয়ে চেয়ে সে দেখে নেয়। তারপর সে স্পর্শ করে দেহকে। একটা হিমশীতল স্পর্শ প্রথমে কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করে। তারপর দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়। অনুভূতির তীব্র আবেগে দেহ নড়ে ওঠার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে চিৎকার করে চিৎকার করে বলতে। কিন্তু সব চেষ্টা তখন নিষ্ফল হয়ে যায়। সব চেতনা তখন নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাস পতনে মৃত্যুর পরোক্ষ স্পর্শ অনুভূত হয়। অনুভূত হয় কেমন করে শিথিল হয়ে আসে দেহের শিরা-উপশিরা, কেমন করে আলো নিভে আসে চোখের, কেমন করে এ জগতের সমস্ত অনুভূতি একে একে লুপ্ত হয়ে যায়।

মানুষের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আবেদন-নিবেদন, মানুষের সমস্ত ভালবাসাকে মূল্যহীন করে দিয়ে এক লহমায় সব কিছুকে নস্যাৎ করে দেয় মৃত্যু। মৃত্যুর এরূপ আমার দেখা। বাবার মৃত্যুর সময় আমিই ছিলাম কাছে। তাই এই মৃত্যুর রূপ আমার হৃদয়কে আর আলোড়িত করে না।

আঘাত করেছিল পৃথার মৃত্যু সংবাদ। মৃত্যুর সংবাদ এমন করে যে অসাড় করে দিতে পারে মনকে, আমার জানা ছিল না। সেদিন মনে হয়েছিল সমস্ত বুকটা যেন খালি ঠেকছে। সমস্ত আবেগ যেন নিথর হয়ে গিয়েছে। এই পৃথিবীতে আনন্দ, হাসি, গান আর প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই।

মোতি সাহেবের বিছানার পাশে দাঁড়ানো লোকজন, ডাক্তার, ওষুধের তীব্র গন্ধের মধ্যে আমার সেই পুরনো স্মৃতি ফিরে এল। দেখলাম আমার চারপাশে কঠিন কালো অন্ধকার।

রাত বাড়ছে। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। ডাক্তারও কর্তব্যের সমাধা করে বিদায় নিয়েছে। হামিদা, পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে বাবার মাথার কাছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। এক মনে, এক ধ্যানে যেন ঈশ্বরকে ডেকে চলেছে।

সবাই যেন রাতের অন্ধকারে এক অশরীরী মূর্তির আবির্ভাবের আশায় কম্পমান। একটু অসতর্ক হলেই সে যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে। সমস্ত চেষ্টাকে নিষ্ফল করে দিয়ে চলে যাবে এক মুহূর্তে।

মোতি সাহেবের হঠাৎ যেন চেতনা হল। অতি ক্ষীণ শব্দে মনে হল বলে উঠলেন—কে?

মুখের কাছে এগিয়ে যাই।

হামিদা, হামিদা কোথায়?

আব্বা! হামিদার গলা কান্নায় বড় করুণ শোনাল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সামনে এসে বসল হামিদা।

মা।

মোতি সাহেব যেন আর কাউকে খুঁজলেন।

কিছু বলবেন বাবা?

মুমূর্ষু-দৃষ্টিতে একটা দ্বিধার প্রকাশ মোতি সাহেব চোখ বুজলেন একবার। চোখ খুললেন আবার। কিছু বলতে চাইছেন মনে হল। চোখ মুখে তাঁর স্নেহের প্রকাশ। হামিদা তাঁর কানের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবেন আব্বা?

মোতি সাহেব বড় অপরাধীর মতো একবার চাইলেন হামিদার দিকে।

মা!

কী কষ্ট হচ্ছে?

না।

এগিয়ে নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবেন আমাকে?

ইশারায় যেন বললেন, না।

হামিদাকে বললাম, পাশের ঘরে আছি, দরকার হলে ডেকো।

মোতি সাহেব যেন খানিকটা স্বস্তি পেলেন। চোখের দৃষ্টি সামান্য সহজ হয়ে এল।

ভোর তখনও হয়নি ভাল করে। শহর হয়ে ওঠা এই জনপদে তখনও অন্ধকার জম-জমাট। জানালা দিয়ে চাইলে দেখা যায় আকাশ আর মাটির সঙ্গমে নিকষ কালো অন্ধকার কিছু পাতলা হয়ে আসছে। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করি, পাশের ঘর থেকে কোনও শব্দ আসছে কি না।

না কোনও শব্দ নেই।

দরজা খোলাই ছিল। দেখি মোতি সাহেবের বিছানার ওপর মোতি সাহেবের বালিশেই মাথা রেখে ওঁর পায়ের কাছে অকাতরে ঘুমোচ্ছে হামিদা। এ অবস্থায় ওকে যেন চেনা যায় না। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ওর যেন হঠাৎ দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে।

ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগোচ্ছে। কতক্ষণে এই রাত শেষ হবে! প্রতীক্ষার আলস্যে অস্থির হয়ে উঠি। দেখি হামিদা জেগে গিয়েছে।

অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করি, বাবা কেমন আছেন হামিদা?

হামিদা সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। বলে, ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিতে হবে। তুমি কি পারবে?

ওর গলাব আওয়াজ শুনে কেমন যেন ভয় হল। এমন সুরে তো কখনও কথা বলে না হামিদা। রাত্রে কী এমন অঘটন ঘটল। মোতি সাহেব একান্তে হামিদাকে কী বলতে চেয়েছিলেন।

একটু ইতস্তত করি, কিন্তু এখন তো উনি ঘুমোচ্ছেন।

হামিদা কর্কশ-কঠিন হয়ে উঠল। বলল, যা বলছি তুমি পারবে কিনা?

ওর গলার আওয়াজ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পাগলের মতো ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর বাড়ি। ডাক্তারবাবুকে ডেকে তুললাম। ছুটিয়ে নিয়ে এলাম এ বাড়িতে। সমস্ত হিসেবটা কেমন যেন গোলামাল হয়ে গেল হঠাৎ।

হামিদার মুখে এক অস্বাভাবিক কাঠিন্য, অথচ চোখে আদ্রর্তা। নিজেকে যেন অনেক কষ্টে চেপে রেখেছে।

মোতি সাহেবের ঘরে তখন নিঃশব্দ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ডাক্তার চুপ করে বসে আছেন মোতি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে। এই বুঝি আসবে চরমতম মুহূর্ত। এখনই শুরু হবে অবশ্যম্ভাবী তার পদসঞ্চার। ছায়া ছায়া ভোর, নীলচে কালো অন্ধকার। কিছুই বুঝতে পারি না। ডাক্তারের মুখ দেখি একবার পরক্ষণেই মোতি সাহেবের মুখ দেখি। কোথাও কোনও বিরক্তি নেই। স্তিমিত চোখ যেন ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে অন্য কোনও লোকে নিবদ্ধ হয়ে আছে। যেখানে জীবন নেই, মৃত্যু নেই—অমৃতলোক। মুখে যেন সূক্ষ্ম একটা হাসির ক্ষীণ রেখা লেগে রয়েছে।

হামিদা এক ফালি চাঁদের মতো বসে আছে। তেজ নেই, আছে স্নিগ্ধ শীতল ছায়া। সারা রাত বসে আছে ওই এক জায়গায়, চেহারায় এক রাশ বিষণ্ণতা।

পুবের আকাশ আস্তে আস্তে ফরসা হয়ে আসছে। কোথাও কোনও শব্দের আড়ম্বর নেই। এখানে আজ মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। তাই সমস্ত পৃথিবী শোকে মুহ্যমান।

একফালি চাঁদ এবার যেন ঈষৎ স্পন্দিত হল। ছায়া ছায়া শরীর কথা বলে উঠল। বলল, তপন, তাড়াতাড়ি এসো—আব্বা চলে যাচ্ছেন।

আকাশটা ঘোলাটে। কোথাও চাঁদের চিহ্নমাত্র নেই। ভয়ার্ত ভোরের অন্ধকার যেন হঠাৎ আরও ভয়াল হয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু মোতি সাহেবের ধরা হাতটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন ওঁর বুকের ওপর। ঘরে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

মসজিদ থেকে ভেসে এল আজানের ধ্বনি। পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলোর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লোকজনের ভিড় বাড়িতে লাগল। সবাই এসে মোতি সাহেবের প্রশংসা করছে। ওর ছেলে নেই, মনসুর সাহেব ভাঙা গলায় কিছু বলার চেষ্টা করে মুখ নিচু করলেন। তারপর পাঞ্জাবির কোনা দিয়ে চোখ মুছলেন ঘন ঘন। উপস্থিত সবার চোখ ছলছল করতে লাগল। আবার একটা মৃত্যু! জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে...। না অমরত্বের কথা বলতে চাই না। তাই বলে মৃত্যু এত ঘনঘন আমার সামনে আসবে? মৃত্যু, দুঃখ, বিরহ, শোক সবকিছু নিয়েই জীবন। কিন্তু জীবনে হাসিও তো আছে, আনন্দও তো আছে। তবে আমার জীবনে সেই স্বাদগুলো কি অধরাই থেকে যাবে?

এ মাসে ঋতুর দেখা পায়নি হামিদা। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছে, ওর পেটে বাচ্চা এসেছে।

রাতে ও যখন এ খবরটা আমায় দিল, ওকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরলাম। বললাম, এ পৃথিবীতে আমার মতো সুখী আর কেউ নেই হামি।

ওর উদাস চোখ ঘরের দেওয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কী ভাবছ এত! আমাদের ছেলের নাম কী দেবে?

আমাকে আবার ছুটি নিতে হবে।

আমি তো তোমাকে বলছি। তুমি দেখ, সব ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। ওর পেটের মসৃণ ত্বকে চুমু খেতে খেতে বলি, ডিটিপি তো ভালই শিখে গেছি। এবার অন্য একটা চাকরি যোগাড় করে নেব। খরচ কিছু কমিয়ে দিতে হবে, এই তো?

হামিদা আর কোনও কথা বলে না।

কয়েকদিন পর মহরম। মহরমের মহড়ায় মুসলমান মহল্লায় মাতন লেগেছে। হামিদাকে নিয়ে বের হয়েছি রাস্তায়।

ইসলাম ধর্মের প্রধান হজরত মহম্মদ মোস্তাফার প্রিয়তমা দুহিতা বিবি ফতেমা জোহরার নয়নমণি হজরত ইমাম হোসেন ইরাকের কারবালা প্রান্তরে শহিদ হয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরবর্গসহ তিনি ফোরাত নদীর উপকূলে রাজ্যলোলুপ এজীদের সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। তিনি এজীদের বশ্যতা স্বীকার করেননি বা সন্ধি করতে রাজি হননি। তাই মুসলমানী হিজরী সনের প্রথম মাস পুণ্য-পূত মোহররমের দশম দিবসে ইমাম হোসেনের আত্ম-বলিদানের করুণ স্মৃতি মোহররম সংক্ষেপে মহরম পালিত হয়।

হজরত মহম্মদের প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসেনের পৌরুষ প্রোজ্জল শাহাদাতের শোক স্মৃতি স্মরণ করে মোহররমে অনুষ্ঠিত হয় "মজলিশ" অনুষ্ঠান। পাঠ করা হয় মর্সিয়া শোকগীতি। মিছিল বের করা হয়। শোক প্রকাশ করা হয় বুক চাপড়ে "হায় হোসেন, হায় হোসেন" হাহাকারে। কারবালার প্রান্তরে বীরোচিত আত্মোৎসর্গের ঘটনাকে স্মরণ করে আয়োজন হয় লাঠি খেলা, অসি খেলা, মশাল খেলার।

"দুলদুল" ঘোড়ায় চড়ে ইমাম হোসেন গিয়েছিলেন লড়াইয়ের ময়দানে। কিন্তু দুলদুল ফিরে এসেছিল শূন্য পৃষ্ঠে। মোহররমের মিছিলে তাই সুসজ্জিত অশ্ব, সেই দুলদুলেরই হৃদয় দোলানো করুণ স্মৃতি বহন করে। কালের এমনই প্রভাব, লোকাচারের এমনিই মহিমা যে শোকাবহ ঘটনার স্মৃতি উদযাপনেও এসে গেছে আজ উৎসবের মেজাজ, আনন্দের আবহাওয়া। স্থানীয় মাঠে বসে গেছে মেলা, দোকানপাট, বেচাকেনা হচ্ছে নানারকম জিনিসপত্র।

হামিদাকে নিয়ে মেলায় ঘুরি। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। অনেক মানুষের মিলন তাই বোধ হয় এই সব জমায়েতকে বলে মেলা। এটা সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখে হামিদা। কেনে শুধু একটা কাঠের চাকি বেলুন আর একটা লোহার খুন্তি। দেখে শুনে আমিও হেসে ফেলি। বলি, সাধারণ গ্রাম্য বধূদের থেকে তুমি আলাদা হতে পারলে না?

কই আর পারলাম। হামিদা বলে। মেয়েদের হাতে হাতা-খুন্তি তোমরাই ধরিয়েছ। পড়িয়েছ বালা তোমরাই ঘরে পোরার লক্ষ্যে।

তা যা বলেছ। মেয়েদের ঘরে পুরতে পারলে আমরা খুশিই হই।

সবে ঘুম থেকে উঠেছি। সঞ্জয় এসে হাজির। বলল, উঠেছিস, তোকে একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে।

কেন বলতো?

কাকিমা ডেকেছে।

কী ব্যাপার বল তো?

তা আমি জানি না।

শোভনা আমার কাছে একটা খবর জানতে চেয়েছিল। সেটা আর জানানো হয়নি।

কী কথা?

বলেছিল একজনের ব্যাপারে খোঁজ করতে।

সঞ্জয় বলল, হলধর? হলধরের কথা বলছিস?

না। সে তোকে বলা যাবে না।

আমার কথা সঞ্জয়ের শুনতে ভাল লাগছিল না। ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলি, তা হলে জয়নগর যেতে হবে বলছিস!

সে তোর ইচ্ছে।

সঞ্জয় চলে গেল। বারান্দায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলাম কী করব। কোনও কূল-কিনার করতে পারলাম না। আবার ফিরে এলাম ঘরে। এ বাড়িতে এখন অনেক লোকের আনাগোনা-অবশ্য মোতি সাহেবকে সবাই মান্যগণ্য করত। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আমার সাথে আলাপ জমায়। জিজ্ঞেস করে আমার আর কে কে আছে। কাঁদি থেকে কেন এদিকে এলাম। কেউ কেউ ভাল ভাল উপদেশ দেয়। বলে কোলকাতা বড় আজব শহর, এ শহরের আজব কাণ্ডকারখানা।

ওদের কথা শুনি। কখনও ভাল লাগে, কখনও লাগে না। একদিন এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমায় উপদেশ দিলেন—তোমায় আর চাকরি করতে হবে না। ওতে আর ক'টাকা পাও?

চমকে উঠলাম। এটা হামিদার কথা নয়তো? হামিদা এখন কাজ ছেড়ে দিতে চাইছে। অথচ আমি যখন অনুরোধ করছিলাম, তখন কান দিচ্ছিল না। বললাম, চাকরি না করলে খাব কী? বউকেই বা কি খাওয়াব! চাকরি না করলে বাঁচব কী করে?

তিনি বললেন যারা চাকরি করে না তারা কি খেতে পায় না? তারা কি বেঁচে নেই?

কিন্তু আমার যে কেউ নেই মিঞা সাহেব! আর আপনি আমায় বউয়ের পয়সায় খেতে বলেন? আমার যে দোজখেও স্থান হবে না।

বুড়ো বলে, আমার কে আছে? আমাকে কে খিলাচ্ছে? খিলানোর মালিক যদি খিলায় তো শয়তানের সাধ্যি আছে তোমাকে ধরে?

নিজের কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারিনি। জিজ্ঞেস করি, মিঞাসাহেব আপনার তো কেউ নেই শুনেছি, তা আপনি এই বুড়ো বয়সে এখনও গদিতে বসেন কেন? এত কারবার করে পরেসান হচ্ছেন? কার জন্যে? আপনার এত টাকা খাবে কে?

বুড়ো থতমত খান। উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। আর কোনও কথার জবাব দিলেন না। জবাব দেবে কী, বছর তিনেক আগে হজ করে এসে মিঞা হাজী হয়েছেন। মেয়ের বয়সী এক মহিলাকে নিকে করে বিবি করেছেন। এখনও সে বিবি'র কোনও ছেলেপুলে না হওয়ায় আবারও ভাবছেন।

আমি চাই না হামিদা কাজ ছেড়ে দিক। বলেছি কিছুদিন ছুটি নাও। হামিদা শোনে না। বলে, ছেড়ে দিতে হয় একবারে ছেড়ে দেব। হঠাৎ ওর ভাবনার এই পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাই না। বাড়িতে যারা আসা যাওয়া করে এ কী তাদের দেওয়া বুদ্ধির ফল? জানি না।

জানতে চাইলে হামিদা কিছু বলে না। খাওয়া দাওয়ায় হামিদার রুচি নেই। বাড়ির আবহাওয়া গুমোট। আমাদের কথাবার্তাও কমে গিয়েছে। অথচ এসময় হামিদার খাওয়া দাওয়া ভাল হওয়া উচিত। ওকে খাবার কথা বলি। নড়ে না। বিছানায় শুয়ে থাকে মুখে হাত দিয়ে। গিয়ে আবার নাড়া দিই ওকে। বলি, খাবে চল। তুমি হাত ধুয়ে টেবিলে বস। আমি বেড়ে নিয়ে আসছি।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি এক কোণে একটা আরশোলা চুপচাপ বসে শুঁড় নাড়াচ্ছে। আমার উপস্থিতি কেয়ারই করল না। আরশোলাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। মাথায় গোল দাগটা যেন চোখ দুটোকে বড় করে চিহ্নিত করে দিয়েছে। মনে হল ওটাও যেন আমাকে দেখছে অনাহুত অতিথির মতো। অদ্ভুত গাঢ় বাদামী রঙ। এঁটো বাসন চাটবার লোভে এসেছে। ওর দিকে চোখ পড়তে অদ্ভুত একটা চিন্তা মাথায় এল। ওও-তো এ বাড়িতে আশ্রিত। তাহলে ওর সঙ্গে আমার তফাত কী?

কী হল? হামিদার কথায় চমক ভাঙলো। তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে টেবিলে এলাম।

খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল আরশোলাটা যেন টেবিলে থালার ধারে মুখ লাগিয়ে কী খাচ্ছে। মুখ নড়ছে না, শরীর নড়ছে না, শুধু শুঁড়টা অল্প অল্প নড়ছে। ভাতের থালাটা একবার নড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ভাবলাম টেবিলে আরশোলাটা আসবে কী করে? কী ভেবে টেবিলের নিচে তাকালাম।

দেখি সেই আরাশোলাটা। পায়ের আওয়াজ করলাম। ভয় পেয়ে যদি চলে যায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আরশোলাটা কোনও ভয় পেল না। নড়ল না, কাঠ হয়ে বসে রইল মেঝেতে। দেখে আমার কেমন গা-টা শিরশির করতে লাগল।

ভাল করে খেতে পারলাম না। ঘিনঘিন করে উঠল সাড়া শরীর। হামিদা উঠে পড়েছে। দুজনে একসাথে থালাগুলো রান্নাঘরে শিঙ্কে রেখে হাত ধুয়ে চলে আসছি। পিছনে ফিরে দেখি—আরশোলাটা এবার থালার ওপর চেপে বসেছে। তাড়াতাড়ি পা চালাই।

হামিদা বেসিনের সামনে, মুখে পেস্ট ভর্তি। রাতে খাবার পর ও দাঁত মাজে। মুখ ধুয়ে আমায় বলে, হাতে মুখে ঘাড়ে গলায় জল দিয়ে ধুয়ে নাও। ভাল ঘুম হবে।

বেসিনের দিকে যেতে গিয়ে দেখি আবার সেই আরশোলাটা। আমার হাত-পা কেমন অসাড় হয়ে পড়ে। মাথা ঝিমঝিম করে। পুবের জানালা বন্ধ। তবু কেন যে এত ঠাণ্ডা লাগছে বুঝতে পারি না। শরীর খারাপের লক্ষণ নয় তো? উষ্ণতার খোঁজে বিছানায় আসি, লেপ ঢাকা দিই শরীরে। রাতের পোশাক পরেছে হামিদা। প্রসাধন করছে। শাড়ি পরেও কখনও শোয় না। নাইটি পরেই শোয়। সব উপরে উঠে আসে রাত্রে। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলে প্রথমেই আমি নাইটি দিয়ে ওর পা ঢেকে দিই। শোওয়ার এই ভঙ্গি আমার একদম বিশ্রী লাগে।

কিছু বললেই বলবে, ঘুমের মধ্যে কারও কিছু ঠিক থাকে না বুঝলে। তা ছাড়া আমি তো তোমার পাশেই শুয়ে আছি।

বিছানায় শুয়েও অন্ধকারের মধ্যে মনে হল অতিকায় একটা আরশোলা আমার দিকে মিটমিট করে চাইছে। এ বাড়িতে আমার অবস্থা দেখে যেন মিটি-মিটি হাসছে।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে আরশোলার হাসি দেখি আর আকাশ-পাতাল ভাবি। কাটা ঘুড়ির মতো হাওয়ায় ভেসে ভেসে এখানে এসে লটকে গিয়েছি। এখানে শুধু কি আমার আশ্রয়! আশ্রয়ের লোভ, চারটে দেওয়াল আর একটা নিরাপদ ছাদের আয়োজন। আর খাওয়া! শুধু কি তাই? আর কিছু কি নয়? সারাদিন ভূতের মতন পরিশ্রম করে এ বাড়িতে এসে এই বিছানায় শুয়ে শান্তি পাওয়া যায়। কেন?

সে তো এই হামিদার জন্য!

অথচ আজ সমস্ত বাড়িতে বৈধব্যের মতো অকরুণ নিঃসঙ্গতা। হামিদার প্রখরতা হারিয়ে গিয়েছে। চলায় বলায় সেই কর্মব্যস্ততা, সেই উন্মুখ চাঞ্চল্য আর নেই। অতিথি ঘরে আসার আগেই প্রদীপ নিভে গেছে, অপার শূন্যতা গ্রাস করেছে হামিদাকে। চুপ করে বোবার মতো সমস্ত শুনছে, আর পুতুলের মতো নড়াচড়া করছে।

মোতি সাহেবকে যখন ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি হামিদা। কান্না দূরে থাক, কথা বলেনি একটাও।

সুলতানার বাবা এসেছিলেন। বলে গেলেন, পিতা মাতা সকলের চিরদিন থাকে না মা, আল্লাহ্ আমাদের পরম পিতা। সেই পরম পিতাকে উপলব্ধি করো মা। পরম সত্যকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করো।

রাত্রে ঘুমোতে পারি না। কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে হামিদা। রাতকে মনে হয় আশ্চর্য রাত! ঘুমও ঠিক নয় আবার জাগরণও নয়। ঘুম আর জাগরণের মধ্যে মনে হয়—মোতি সাহেব বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হিন্দু শব দাহ করে দেওয়া হয়, সব কিছু বিলীন হয়ে যায় ছাইয়ে। ইসলাম ধর্মে কবর দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে পার্থিব শরীর। মনে হয় তিনি যেন দেখতে এসেছেন আমরা কেমন আছি।

সময় যেন সব একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মোতি সাহেব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িতে আর চলছে না কিছু। অচল হয়ে গিয়েছে সব। কালের চাকা ভেঙে গিয়েছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাও বা চলছে মনে হচ্ছে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে যে কোনও মুহূর্তে। দম আটকে আসছে সংসারের।

বাড়িটাও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিন কে দিন। পাঁচিলের মাথাতে শ্যাওলা জমেছে। এখানে ওখানে ঝুল জমেছে। ধুলো আসবাবের ওপর। বেড়ালগুলো হঠাৎ হঠাৎ বিশ্রীভাবে ডেকে ওঠে। সন্ধেবেলাতেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে যায়! আলোগুলো নিবিয়ে রাখি। মিছিমিছি আলো জ্বাললেই তো পয়সা খরচ।

মোতি সাহেবের ঘর বন্ধই থাকে। ও ঘরে আমরা কেউ ঢুকি না। ঢোকবার প্রয়োজন হয় না কারও। তবু মনে হয়, এখানেই এই ঘরটার মধ্যে কেউ যেন বাস করছে। আমাদের সান্নিধ্য উপভোগ করছে। আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে। কেবলই মনে হয়, কোথায় যেন কাছাকাছি কে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, ইট ভাঙছে, ঠুং ঠাং ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। মনে হয় কারা বুঝি .....।

রাত হলেই কেমন যেন সব থম্‌থম্‌ করে। সব চুপচাপ। জানালার পাশে কোথাও ঝিঝি পোকা শব্দের করাত দিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে অন্ধকারকে ভেঙে খান খান করে দেয়। ঝিঁঝিঁ'র ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা দৌড়য়। এইভাবে রাত বাড়ে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের চোখে ঘুম আসে না। জেগে জেগে রাত পাখির ডাক শুনি। এ বাড়ি থেকে বড় মসজিদের মাথাটা দেখা যায়। মসজিদের মাথায় সবুজ পতাকা ওড়ে। পতপত করে হাওয়ায় দোল খায়। তার ওপরে একটা বাতি জ্বলে—আকাশ দীপের মতো। এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ কারও পদশব্দের মতো আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠি। তার পর কখন ঘুমিয়ে যাই। ভোরের পাখির কলতানে জেগে উঠি। যান্ত্রিক কর্মব্যস্ততায় দিনের শুরু ও শেষ হয়। এইভাবে একটা একটা করে দিন কাটে।

একই ট্রেনে এক সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাতায়াত করি আমরা। হামিদাকে দেখলে এখনও মনে হয় কুমারী। ওর পেটে বাচ্চা এসছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। মনে মনে আমি কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। এই আমি বাবা হতাম, হতে হতে হলাম না।

হামিদাকে দেখি—কী যেন ভাবছে। যেন কোনও দিকে নজর নেই। চুলগুলো উড়ছে। মাঝে মাঝে বুকের ওড়না হাওয়ায় সরে যাচ্ছে। কোনও খেয়াল নেই। ও সিঁদুর ব্যবহার করে না তবে কপালে মস্ত বড় একটা টিপ পরেছে।

দুলতে দুলতে গাড়ি চলে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। এরকমই একদিন যেতে যেতে আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে। এখন ও আমার স্ত্রী। নিজের দিকে চেয়ে দেখি—জামাকাপড়গুলো ময়লা হয়েছে। অনেকদিন সাবান দেওয়া হয়নি। আসলে আমাদের জীবনযাত্রাটাই পাল্টে গিয়েছে। শৃঙ্খলাবোধ হারিয়ে গিয়েছে জীবন থেকে।

হঠাৎ নিজেকে বড় দরিদ্র বলে মনে হয়।

পাঁচ হাজার টাকা ধার হয়ে আছে। সেটা এখনও শোধ করা হয়ে ওঠেনি। কেন যে হামিদার সঙ্গে আলাপ হল! কেন যে শোভনার কাছে টাকা ধার করতে গেলাম। এত বড় পৃথিবীতে আমার কি একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলতো না?

আজ যে চলেছি কোন উদ্দেশ্যে? হামিদা চেয়েছে বলেই তো? নিজের যাবার ইচ্ছে এতটুকুও কি ছিল? কিন্তু এখন কি আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু আছে? এই যে জামা প্যান্ট পরে আছি—এ তো হামিদারই দেওয়া। বিরাট জায়গা নিয়ে একটা বাড়ি। তার সাথে হামিদার মতো রূপসী একজন স্ত্রী। ওর বাবার মৃত্যুজনিত কারণে বিরাট অঙ্কের একটা টাকা পাওনা। ওর বাবার অবর্তমানে এখন সব কিছুর মালিক হামিদা।

আমি কি ওদের কেনা গোলাম হয়ে গিয়েছি? হঠাৎ কেমন যেন একটা ঘেন্না হতে লাগল নিজের ওপর। মনে হল হামিদাকে বলি, ফিরে যাই? কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন মুখ দিয়ে বেরুল না কথাটা।

হামিদা বোধহয় ধরতে পারল আমার মনের কথা। জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছ?

নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বললাম, এমন জানলে কিছুতেই আসতাম না।

হামিদা হাসল। বলল, কেন কী হয়েছে বলো তো?

তুমি একটাও কথা বলবে না, আমার বুঝি তা ভাল লাগে?

কী কথা বলব?

তার চেয়ে আমি নেমে যাই?

তোমার বড্ড অভিমান। পুরুষমানুষের এত অভিমান ভাল নয়।

কতদিন আমরা বের হইনি কোথাও বলো তো? আগে আমরা কত জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। এই কলকাতায় কত নতুন জায়গা তোমার সাথে দেখেছি।

সে সব দিন কি আবার আসবে?

কেন আসবে না? যাবে একদিন দক্ষিণেশ্বরে?

হ্যাঁ যাব।

সামনের শুক্রবার ছুটি আছে—যাবে?

যাব।

সারাদিন আমরা দক্ষিণেশ্বরে কাটাব। পুজোটুজো কিছু নয়, কেবল গঙ্গার ঘাটে বসে থাকব।

বেশ তাই হবে।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছের সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক থাকে না বেশির ভাগ সময়। ট্রেনে যেতে যেতে একটা ছোট্ট টিলা কিংবা পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর ছিমছাম নদী দেখলে অনেকেরই মনে হয়, আহা এখানে যদি একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকা যেত। কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ ঘর বানিয়ে থাকতে যায় না।

তেমনি শুক্রবার আসতে হামিদা ভুলে গেল দক্ষিণেশ্বরের কথা। সারাদিন কোনও কথা না বলে আমি শুধু এপাশ ওপাশ করে সময় কাটালাম। বিকালে কী মনে হল হামিদাকে বললাম, জয়নগর যাচ্ছি, আজ আর ফিরব না।

অনেকদিন পর জয়নগর এলাম। সন্ধ্যা নেমেছে, চারপাশ অন্ধকার। কাউকে ডাকব কি ডাকব না ভাবছি। এমন সময় কে একজন অন্ধকারে এসে ঘাড়ের ওপর পড়ল। ডাকলাম, সঞ্জয়।

সঞ্জয়ই আনন্দ উচ্ছল গলায় আমায় জড়িয়ে ধরল।

তুই! কখন এলি! অন্ধকারে দেখতে পাইনি।

আমিও না।

রুদ্ধ কণ্ঠে বলে সঞ্জয়, কতদিন পরে এলি বল তো?

অনেক পরে দুজনে শান্ত হলাম।

সবাই কেমন আছে রে? জিজ্ঞাসা করলাম।

ও তার উত্তর দিল না। বলল, তোর খবর কী বল! চল ভেতরে চল।

দুজনে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

তুই এখন কি করছিস? জিজ্ঞাসা করি ওকে।

উঠোনে এসে সঞ্জয় চেঁচিয়ে উঠল, আলোটা একবার দেখাও তো! তপন এসেছে। সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছে না।

লণ্ঠন নিয়ে সাদা কাপড়ে কে একজন তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এল। আলো তুলে চাইতেই আমার চোখে কী যেন পড়ল!

শোভনা! তুমি...!

শোভনার হাত থেকে আলোটা হঠাৎ পড়ে গেল। পতনের আঘাতে বাতিটা দপদপ করে জ্বলতে লাগল। সঞ্জয় তাড়াতাড়ি আলোটা তুলে নিয়ে ক্ষিপ্র কৌশলে কল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোটাকে স্থির করল।

আওয়াজ শুনে মাসীমাও বাইরে এলেন।

শোভনা মাথা নিচু করে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে। এ কী ভয়াবহ অপ্রত্যাশিত বিড়ম্বনা! দেওয়ালটা ধরে শোভনা বোধহয় কাঁপছে।

মুখ তুলে শোভনাকে দেখলাম। দাঁড়িয়ে আছে যেন প্রস্তর কঠিন নির্জীব একটা মূর্তি।

চিনতে পারছ?

নম্র সৌজন্য প্রকাশ করি।

তুমি কি একেবারে ভুলে গেলে আমাদের।

না। তোমার এসব কবে হল? আমাকে কোনও খবর দাওনি কেন?

আমার আবার খবর।

একটা দীর্ঘশ্বাস সময়টা কঠিন করে তোলে। মাথা নিচু করে বসে থাকি। এরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলাম না। শোভনা বলে, একবারও তো খোঁজ খবর নাও না। আস না কেন আর?

কী বলবে বলে ডেকেছিলে?

ও সেজন্যে এসেছ?

না। তা নয়।

ভেবেছিলাম তো অনেক কথাই বলব। তা আর হল কই! তুমি নাকি ঘর জামাই হয়ে আছ?

এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

তুমি কি আজই চলে যাবে? কম্পিত স্বরে শোভনা জিজ্ঞাসা করল।

বললাম, যাব বলেই তো ভেবেছিলাম।

হঠাৎ শোভনা আর্তস্বরে বলে উঠল, না না, তুমি চলে যেও।

তাহলে আর কী। চলি।

বলে উঠে পড়লাম। চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই শোভনা জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি আর প্রয়াগপুরে গিয়েছিলে?

না কেন?

যদি যাও তো একটা কাজ করবে? আমাদের বাড়ির এখন কী অবস্থা একটু খবর নিয়ে আসবে?

অনুরোধটা শুনে অবাক হই। শোভনা কি বাপের বাড়ি ফিরতে চাইছে? ওকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করি, একটা কথা সত্যি বলবে? তোমার সঙ্গে হলধরের বিয়ে ঠিক হয়েছিল?

শোভনা ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর শিউরে উঠে পিছন দিকে সরে গেল। বলল, না না। তুমি ভুল শুনেছ:

কী ভুল? কোনটা ভুল?

শোভনা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়, যেন নিশ্চল চৈতন্যশূন্য হয়ে বসেছে।

বলি, হলধরকে আমি চিনে ফেলেছি—সেটা?

শোভনা কোনওরকমে বলে, আমার বড় ভয় করে।

কী ভয়, কিসের ভয়?

শোভনা এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন মনে হল ওর হৃদপিণ্ডটা বুকের খাঁচা ভেদ করে বাহিরে আসতে চাইছে। মরণাহতের অন্তিম নিঃশ্বাসের মত ওর গলা দিয়ে বের হয়ে এল যেন মৃত্যুমন্ত্র। বলল, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও।

শোভনার কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

এমন মর্মভেদী কথা আমাকে যে শুনতে হবে কোনও দিন ভাবিনি। জীবনে অভিমান কী? জীবনে অনুতাপ কী? জীবনের ভুল, ভ্রান্তি, অপরাধের জন্য দেনাপাওনা যদি কিছু থাকে তবে তা মেটাতেই হয়। মেটাতে হয় এ জীবনেই।

আস্তে আস্তে বললাম, তাহলে এই শেষ। আমি চলে যাচ্ছি। এ জীবনে আর এ বাড়িতে ফিরে আসব না। তোমার মঙ্গল হোক! এই বলে সিঁড়ি থেকে নেমে আসি কম্পিত পদক্ষেপে।

পারো তো ভুলে যেও আমায়।

আমি আর দাঁড়াই না। বুঝতে পারি পিছনে অর্ধমূর্ছিতা শোভনা পড়ে রইল।

ত্রস্তপদে ছুটে আসে সঞ্জয়।

তপন! তুই চলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

পারলে ওঁকে ক্ষমা করিস।

ক্ষমা! এ হৃদয়হীন ছেলেখেলার বিষয় নয়। এতে যদি অপরাধ থাকে, তবে শাস্তিও আছে। কিন্তু ক্ষমা? না ক্ষমা নেই। জীবনের অনেক কাজই তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। চলি রে, তোরা সবাই ভাল থাকিস। মাসিমাকে আমার প্রণাম দিস।

বাইরে এলাম। এতদিন এখানে এসেছি, কোনওদিন জিজ্ঞেস করিনি, হলধর তোমার ভাল নাম কী? তুমি কি প্রয়াগপুরে বিয়ে করতে গিয়েছিলে? শোভনা হয়তো ভেবেছিল এমনি করেই চার দেওয়ালের মধ্যে তার জীবন কেটে যাবে। তারপর একদিন চতুর্দোলায় চাপিয়ে চারজন লোক ওকে বিষ্ণুপুরের মহাশ্মাশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু তা হল না। সব আবার নতুন করে জানাজানি হয়ে গেল। জেনে গেছি আমি। আর তাই আমার উপস্থিতি এখন ওর কাছে সব থেকে বিষময়। অথচ ও এখন স্বামীহারা।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। দেখি হামিদার সঙ্গে সাবিত্রীও রয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, ফিরে এলেন যে?

হ্যাঁ। চলে এলাম।

এঁটো বাসনগুলো তুলে নিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিল সাবিত্রী।

ঘুম আসছে না। বিদ্যুৎ নেই যে কম্পিউটারে বসে কাজকর্ম করব। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সাবিত্রী বলল, পান খাবেন জামাইবাবু?

মাদুর পেতে সাবিত্রী বসেছে পান দোক্তা খেতে। এটা ওর অভ্যেস। ধীরে সুস্থে বসে পান দোক্তা খাবে আয়েশ করে আবার অন্যকেও সাধবে পান খেতে।

বললাম, দাও।

সাবিত্রী তার বটুয়া থেকে পান বার করে। ওকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার বর এখন কেমন আছে?

একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সাবিত্রী বলে, কী আর বলব বলুন, আমার কাছে আসে টাকা নিতে। থাকে সেই মেয়েটার কাছেই।

বাঃ। তোমার কাছে আসে টাকা নিতে, আর তুমি নিশ্চয় টাকা দিয়ে দাও।

কী করব বলুন। মেয়েটাও বড় হয়ে উঠেছে, ওর বিয়ে দিতে হবে। বাবা হয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে তো। কী যে হবে কিছুই ভেবে পাই না।

ওকে জিজ্ঞেস করি, কত টাকা খরচ হয় তোমাদের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে?

সাবিত্রী বলে, তা যে যেমন খরচ করতে পারে। আমাদের মতো ঘরেও পাঁচ দশ হাজারের কমে হয় না।

সাবিত্রী পানে চুন খয়ের দিয়ে সুপুরী কাটছিল। হাতের কাজ বন্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করে, কেন বলুন তো? সরকারের কাছে কি কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে?

সাবিত্রী পতাকা নিয়ে পার্টির মিছিলে হাঁটে। যে ঘরে বাস করে পার্টির সাহায্যে তা তৈরি করেছে। রেশনকার্ডে জামাকাপড়, চাল, গম মাঝে মাঝে এসব ওরা পার্টি থেকে পায়। জ্যোতিবাবুর জমানায় ওরা ভালই আছে। তাই আমার কথায় ইঙ্গিত পেতেই পাওয়ার ইচ্ছেটা ওর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাবিত্রী সুপারী দিয়ে পান মুড়ে আমার হাতে দিল। তারপর সে সব সরঞ্জাম গুটিয়ে বটুয়া বন্ধ করে সরিয়ে রাখল।

জামাইবাবু আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন।

কী.বলব! ওকে বলি, তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আগে হোক।

আমার এই কথাতেই সাবিত্রী খুশি হল।

সমস্ত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। আমার পাশে হামিদা শুয়ে। মনে হয় আজ ঘুমিয়ে পড়েছে। ছাদের ওপর এক গাদা পায়রা বাসা বেঁধেছে। রাত্রেও ওরা পাখা ঝাপটাচ্ছে। মোতি সাহেবের ঘরের দক্ষিণ দিকে হাওয়ার ঝাপটা এসে দরজা জানালায় লাগে, একটা অদ্ভুত শব্দ হয় বাতাসে। থর থর করে কেঁপে ওঠে সব কিছু। মনে হয় যেন মোতি সাহেব হাসছেন। কান পেতে শুনি। অবিকল সেই শব্দ। বড় কষ্ট হয় শুনতে। ভয় করে, হামিদা এসব শোনে না তো?

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করি। সমস্ত রাত্রিটা এরকম অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটে। মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। মনে হয় সমস্ত ঘটনাটা যেন স্বপ্ন। স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অলৌকিক।

ব্যাগটা ঝাড়তে গিয়ে দেখি দাদার শেষ চিঠিটা ব্যাগের তলায় এক কোণে পড়ে রয়েছে। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার শেষ দলিল। আশ্চর্য! আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে পরবাসী হয়েছি। দেশে গিয়ে কী দেখব?

হামিদা এসে ঘরে ঢোকে। ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর মিষ্টি গন্ধে ঘরখানা ভরে গেল। ওকে অনেকদিন সাজতে দেখিনি। আজ কিছু পরিবর্তন হয়েছে মনে হল। ওর হাতে এক গ্লাস সরবত।

আমায় ক্ষমা কর তুমি।

কী বলছ হামি?

তোমায় সংসারে বেঁধে শুধু কষ্টই দিলাম।

শুধু সংস্কার, শুধু দুটো মন্ত্র জেনো মানুষকে সত্যিকারের সুখী করতে পারে না।

আমাকে তুমি ভুলে যাবে দুদিন হলেই।

তোমাকে ভুলে যাব?

হামিদার হাত থেকে কাচের গেলাসটা ঝনাৎ করে মাটিতে পড়ে ছত্রখান হয়ে গেল। সে শব্দে আমারও ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি বিছানায় একলা শুয়ে আছি। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে।

সমস্ত স্বপ্নটা আবার পুরোপুরি ভাবতে লাগলাম। সত্যি এ কেমন করে হয়। আমার মনের ভেতরের কথাগুলো আমি বলিয়ে নিয়েছি হামিদার মুখ দিয়ে। কিন্তু হামিদা কোথায়? উঠে পড়ি। জল খাই। দেখি হামিদা চা নিয়ে এসেছে।

চা খেয়ে হামিদাকে বললাম, একবার দেশে যাব ভাবছি।

ও কিছু বলল না। রেডি হয়ে নিলাম। ঘর থেকে বের হবার সময় হামিদা জিজ্ঞাসা করল, কবে ফিরবে?

ওকে বলি, কাল না তো পরশু।

দরজা খুলে দেবার সময় সাবিত্রী জানতে চাইল, কবে ফিরবেন জামাইবাবু?

ভাবলাম বলি, আমি আর আসব না। কিন্তু বলতে গিয়েই সামলে নিয়েছি নিজেকে। বললাম, ভাল না লাগলে কালই চলে আসব।

সাবিত্রী দরজা বন্ধ করে দিল। পিছনের পথ আমার বন্ধ হয়ে গেল। হাঁটতে থাকি স্টেশনের দিকে।

শিয়ালদহ স্টেশনে যখন পৌছলাম অফিস টাইমের ভিড় কেটে গেছে। অবাঙালি মানুষজনে ভরে গিয়েছে কোলকাতার পথঘাট। স্টেশনের মহল্লা ছুয়ে ছুঁয়ে সানাই এর একটা সুর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। সত্যিই অনেক দূর। অনেক অনেক দিন আগে একটা ডিঙি নৌকাতে করে সাদা চামড়ার একটা মানুষ এসে নেমেছিল এই খানে। তারপর একে একে আরও অনেকে এল। তারা এল এখানকার সম্পদ লুঠ করতে। এখানকার মেয়ে মানুষ ভোগ করতে। মানুষ কিচ্ছু বলেনি। সেঁশনের চত্বরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়—এক সময় এ দেশটার নাম ছিল বঙ্গদেশ, আজ নাম শুধু পশ্চিমবঙ্গ। সানাই-এর সুরের লয়ে কেমন যেন নেশা লাগছিল।

ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে। ধীরেসুস্থে ট্রেনে গিয়ে বসলাম। চারদিকে ঝাঁট দেওয়ার ব্যস্ততা। বোধহয় কোনও মন্ত্রী আমলা আসবে। বহরমপুর পৌছব সেই

বিকেল নাগাদ। তারপর কান্দী। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। গ্রামে সন্ধে হতে না হতেই নিশুতি হয়ে যায় সব।

সমস্ত গ্রামটা যেন চোখের ওপর ছবির মতো ভেসে ওঠে। বটের ঝুরিতে দোল খাওয়া। ঝড়ের রাতে আম কুড়নো। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে পেয়ারা চুরি। আখের জমি থেকে আখ ভেঙে খাওয়া। কাঁদরের জলে নৌকা ভাসানো।

রাত্তির বেলা বাঁশঝাড়ে মড়মড় শব্দ হতো। ঠাকুমা বলতেন, ও ঝাড়ে ভূত আছে। কী যে গা ছমছম করত। জোনাক জ্বলা তেঁতুলগাছটার দিকে তাকাতেই পারতাম না। অথচ সকালবেলায় যে কে সেই। রাখাল কেরষানরা গরু বাছুর নিয়ে ওর তলা দিয়েই মাঠে যেত। কবে কার ঘাড় মটকে দিয়েছিল ভূতে সেই গল্প শুনিয়ে ঠাকুমা আমায় ভয় দেখাত। বলত, যখনই ভয় পাবি রাম নাম করবি। বলবি ভূত আমার পুত। সঙ্গে একটা লোহা রাখবি, দেখবি ভূতে তোকে ছুঁতেও আসবে না। রাম নামকে ভূতে ভয় পায়। তবু তেঁতুলতলা দিয়ে যেতেই কেমন ভয় লাগতো। দুরদুর করত বুক।

কোলকাতা থেকে আসতে আগে ঘণ্টা ছয়েক সময় লাগত। আজও সেই সময়ই লাগল। স্টেশনের একটা চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে শুনলাম চার বছর হল ইলেকশনের আগে গ্রামে ঢোকার রাস্তাটা পাকা হয়েছে।

ভাবলাম তাহলে একটা রিকশা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু সন্ধের মুখে একটা রিকশাও চোখে পড়ল না। হাঁটতে শুরু করলাম। পিচ সব কবে উঠে গেছে। ধারালো পাথরকুচি, খোয়ায় ভরে আছে রাস্তা। মাঝে মাঝে তাতে আবার বড় বড় গর্ত। দেড় ঘণ্টার বেশি লাগল তিন কিলোমিটার হেঁটে আসতে।

একটা বুড়ো মানুষ কোন দিক থেকে এসে খুব কাছে চলে এসেছে। হঠাৎ দেখে খুব অবাক হয়ে যাই।

বুড়ো একেবারে পাশে এসে মুখ তুলে দেখে।

পরনে ময়লা থান কাপড়। খুব জীর্ণ শরীর। পিঠ বেঁকে গেছে। মুখের চামড়ায় অসংখ্য শিকড় বাকড়।

লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ো দাঁড়ায়। একটু হাঁফায়। মুখ তুলে বলে, কে গো বাবা, চিনতে পারলুম নি তো?

একটু হেসে অপ্রস্তুত হয়ে বলি, আমি এখানে থাকি না যে।

তা কোথায় থাকা হয় বাপজীবনের?

আমি কোলকাতাতে থাকি।

বুড়োর ভাঙাচোরা শুকনো মুখে আলো ফুটে উঠল। তা কাদের বাড়ি যাবে?

বদ্যিপাড়ায়।

কার ছেলে?

হরনাথ চক্রবর্তী ..।

অ। এবার তোমাকে চিনতে পেরেচি বাবা। হরুর ছেলে, তুমি তো সেই তপু। হ্যাঁ বাবা, আমাকে তুমি চিনতে পারলে নে—আমি ফড়িং-এর বাবা। ফড়িং-কে মনে নেই? ছেলেবেলায় তুমি আর ফড়িং এক সঙ্গে কত খেলা করতে। তুমি কত আসতে আমাদের ঘরে। এবার মনে পড়েচে?

মনে পড়েছে। বুড়োকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বলি, কোথায় গিয়েছিলেন? এত বেলায় ফিরছেন?

বুড়ো বলল, কোথায় আর যাব বাবা। জমি দেখতে গেছিলুম। আমার ভাগ্য! ফড়িং-কে পুলিশে ধরে নে গেল। বলে ও কিনা ডাকাত হয়েছে। সেই ফড়িং কোথায় চলে গেল। আমার মেয়ে শোভনা, তাকে কি মনে আছে তোমার? ফড়িং-এর চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, বিয়ের পিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে গেছিল? সে তো কোলকাতার দিকেই থাকে। তার কোনও খবর জান বাবা? সেই যে একটা ছেলে বরযাত্রী এয়েছিল বিয়ে করে নে গেল, তারপর আর কোনও খপর পাই না। তা হ্যাঁ বাপ, কার কাছে থাকবি, ঠাকুমা তো নি। তোর দাদার বউটা যা দজ্জাল। শুধু স্বামীর কানে মন্তর দিচ্ছে। দাওয়ায় গিয়ে বসলে একটুকুন চাও দেয় না রে!

না। আপনি বাড়ি যান, আপনাকে আর ঝামেলা করতে হবে না।

তা হোক গে। কদ্দিন দেকিনি—একটু দেকি বাবা তোকে। আজ থাকবি চল আমার কাছে।

বুড়ো আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। রাত্রে বুড়োর কাছে থেকে আমার লাভই হল। গ্রামের অনেক খবর পেলাম। গ্রামের মানুষ আক্কেল আলি এখন মৌলবী হয়েছে। কোরবানির সময় চৈতন্য ঘোষের বাথানের বুড়ো গরুটা সস্তায় কিনে মুসলমান পাড়ায় আড়ালে জবাই করছিল—এই নিয়ে গ্রামে একটা গোলমাল বেধেছিল। চৈতন্য ঘোষ ইদানীং গলায় কণ্ঠী ধারণ করে কীর্তনের দল খুলেছে। ওদের কীর্তনের দল গ্রাম পরিক্রমার সময় মসজিদের সামনে এলে কীর্তন বন্ধ করে দেওয়া হয়—এই নিয়েও গ্রামে উত্তেজনা রয়েছে।

সকাল বেলাতেই বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আর থাকবি না বাপ?

না আজই চলে যাব।

আজই চলে যাবি? আবার কবে আসবি বাপ?

চুপ করে থাকি।

আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুড়োর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। চোখ নামিয়ে নিই।

ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে থাকে বুড়ো। আমি হাঁটতে থাকি। আগের মতোই খালটা সরু জলের ধারা নিয়ে বহে যাচ্ছে রাস্তার পাশে পাশে। এক দিকে ধানখেত, ধান কাটা হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে খেসারির স্নিগ্ধ সবুজ মাথাগুলো দুলছে। পথের পাশে সেই বৈঁচি, শেঁয়াকুল, বনতুলসী, আকন্দের ঝোপ, বুনো গাছগাছালি সব আগের মতোই। মাথার ওপর সেই কতকালের পুরনো আকাশ।

কড়ি'র বরের সঙ্গে দেখা হবে না জানি, সে এখানে থাকে না। কিন্তু কড়ির সঙ্গে? নিমাই তো কোনও চাকরি পায়নি, চাষবাস করে। একবার চাষ করার জন্য কিছু টাকা চেয়েছিল দাদার কাছে। বলেছিল ধান বিক্রি করে শোধ করে দেব। শ্রীকান্ত একটা মনোহারি দোকান দিয়েছে শুনেছিলাম।

আগে প্রতিবার দুপুরের আগে এসে বিকেলের মধ্যে ফিরে যেতাম। দু-তিন ঘণ্টা

কাটাতাম বাড়িতে। ঠাকুমা কত কথাই না বলতো। কত কথা জমে থাকত ওঁর মনে। বিকেল হয়ে আসতো—ঠাকুমার কথা শেষ হতো না। দাদা বিরক্ত হতো।

তারপর ঠাকুমার শরীর ভেঙে গেল। কথা বলতে পারত না। শুধু চেয়ে থাকত। বলতাম, কী দেখছ অমন করে?

ঠাকুমা বলতেন, তোকে। মুখে নয়, ইশারায়।

তারপর ঠাকুমা চোখেও ভাল দেখতে পেত না। চেয়ে থাকতে থাকতে ঠাকুমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে যেত।

বলেছিলাম, একজন ভাল ডাক্তার দেখাও বহরমপুরে। দাদা বিরক্ত হয়েছিল। ঠাকুমার চশমা করানো হয়েছিল কিনা জানা হয়নি। ঠাকুমা দেহ রেখেছিলেন। দাদা টেলিফোন করে সেদিনই আমায় খবরটা দিতে পারত—দেয়নি। এখানে একটা এস টি ডি বুথ আছে। ঠাকুমা মারা যাবার পাঁচ দিন পরে খবরটা পেয়েছিলাম—সেই টেলিফোনেই।

খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। অভিমান হয়েছিল দারুণ। তারপর আর গ্রামে আসার কথা ভাবিনি।

এখন আর আমার কোনও অভিমান আছে কি? তাহলে এলাম কেন? কই দাদার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না তো! এই গ্রামে, এই সংসারে কারও কাছে আমার আর তেমন গুরুত্ব নেই।

মন ভেঙে গেছে। মনের মধ্যে শান্তি নেই। অদ্ভুত একটা অস্থিরতা, একটা চাপা যন্ত্রণা, উদ্বেগ মনের মধ্যে সব সময়। কিছুই ভাল লাগে না। অথচ ভাল না লাগার কোনও কারণ নেই। বিয়ে করেছি, বউ চাকরি করে, আমিও রোজগার করছি। মাথা গোঁজার ভাল ঠাঁই রয়েছে।

যদি এই গ্রামেই থাকতাম—। কী হতো?

গ্রামের মধ্যে দিয়ে যে পথটা গেছে, সেই পথে হাঁটতে হাঁটতে আমার এইসব কথাই মনে পড়ছিল, গাছপালা, লতাগুল্ম—উদ্ভিদের গন্ধভরা ছায়াঢাকা পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ছিল ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। বড় হয়ে যখন কলকাতায় পড়তে গেলাম, সেই দিনটার কথা।

ঠাকুমা অনেকটা পথ আমার পিছনে পিছনে এসেছিল। শেষবার যখন এসেছিলাম ঠাকুমা হাঁটতে পারছিল না। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু আসছিল পিছনে পিছনে। সরানের শেষে দাঁড়িয়ে ঠাকুমার দিকে ফিরে বলেছিলাম, আর কতদূর আসবে, আর এসো না—তোমার ফিরতে কষ্ট হবে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেছিল, তপু আবার কবে আসবি?

বলেছিলাম, আসব। ঠিক সময় করে। তুমি চিন্তা কোর না। ভাল থেকো।

ঠাকুমা চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল, আসবি তো? ভুলে যাস না যেন, আসিস মনে করে।

ঠাকুমার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি।

বাঁশবনের ঘন ছায়ায় ছাতারে পাখির দল খেলা করছে। শুকনো পাতার মর্মর শব্দ উঠছে। উড়ছে ধুলো। কাছেই কোনও গাছের পাতার আড়াল থেকে কী এক পাখি

সুর করে ডেকে যাচ্ছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে ঝিল্লির তান। গ্রামের এদিকটা নির্জন। ছেলেমেয়ের দল স্কুল-কলেজে চলে গেছে। বউ ঝিরা স্নান সেরে এখন রান্নাঘরে। পুরুষরা গেছে যে যার কাজে। গ্রামে এখন কাজের অভাব তেমন নেই। নদীর ধারে তিনটে বড় বড় ইটভাটা হয়েছে।

ইটের বাড়ি অবশ্য দু-চারটের বেশি চোখে পড়ছে না। বাড়িঘর প্রায় সবই সেই আগের মতো। মাটির দেওয়াল টিনের চাল। আগের মতো কুঁড়ে ঘরও রয়েছে অনেক। ছিটে বেড়ার দেওয়াল, খড়ের চাল।

পথে দু চারজন যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের কাউকেই আমি চিনি না। আমার চেনা লোকজন আর বেশি নেইও গ্রামে। আমার ছেলেবেলার সঙ্গীরা অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কে আছে, কে নেই—জানিও না।

চেনা গাছপালাগুলো শুধু আছে যেমনটি দেখেছিলাম। সবুজ সতেজ। শিরীষ, সাঁই বাবলা, পিটুলি, আশশেওড়া, গাব, ডুমুর, নিম, তেঁতুল, বট, পাকুড় আর অজস্র তাল গাছ।

বৈঁচি, বাসকের ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে গুলঞ্চ, তেলাকুচ আরও কত নাম না জানা লতাগুল্ম উঠে গেছে। এক জায়গায় দেখি সাদা আর নীল অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। মায়াময় নীলের মধ্যে সাদা অপরাজিতাগুলো বুকের মধ্যে একটা আকুলতা জাগায়। একটা আনন্দ, একটা বেদনা, স্মৃতি-বিস্মৃতির স্বপ্ন ও বাস্তবের, অস্তিত্ব অনস্তিত্বের একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি যা স্মৃতি ও সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য এক আনন্দ আর বিষাদ জেগে ওঠে।

যেতে যেতে কখন কাঁদর পাড়ের মাঠের প্রান্তে চলে এসেছি। সোনালি বিস্তৃত মাঠ—ধানের খেত। ধান কাটা চলছে। কোথাও রবি শস্যের হাল্কা, ঘন, প্রগাঢ় আস্তরণ নানা জায়গায় সবুজ খেতের আলো হয়ে এক এক জায়গায় পড়ে আছে। কাঁদর পাড়ে সার বাঁধা বাবলা গাছ। অনেক দূর পর্যন্ত আশ্চর্য সবুজের স্রোত বয়ে গেছে আকাশের নীল সীমানা অবধি। আকাশ আরও অনেক দূরে গিয়ে মিশে গেছে মাঠের শেষে আর এক গ্রামের সবুজ সীমারেখায়।

কাঁদরের পাড় বরাবর সরু একটা পথ চলে গেছে। সেই পথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে একটা বাবলা গাছের ছায়ায় বসলাম। চারপাশটা আলো হয়ে আছে। ফুল এসেছে বাবলা গাছে। অনেক ফুল ঝরে পড়ে আছে চারপাশে। ছোট ছোট হলদে রঙের ফুল। খুব সূক্ষ্ম একটা সুবাস বাতাসে ঘোরাফেরা করছে। সেই সুবাসে ডুবে যাই। ঝিঁঝি পোকারা ডেকে চলে চারপাশে। একটানা বিরামহীন এই ডাক, সুর অদ্ভুতভাবে আচ্ছন্ন করে আমাকে। আচ্ছন্নতার মধ্যে মনে হয় আমার চারপাশে জড়ো হয়েছে আমার শৈশবের পাখিগুলো। আমার চারপাশে শালিখ, ফিঙে, দোয়েল, টুনটুনি, ছাতারে, হলদে, হট্টিট, মাছরাঙা এমন কী নীলকণ্ঠ পাখিও ভিড় জমিয়েছে।

একদল ছাতারে দল বেঁধে ঝগড়া করছে। একটা শালিখ এসে অনেকক্ষণ বসে রইল সামনের ঘাসের ওপর। একটা ফিঙে বাবলা গাছ থেকে নেমে এসে বসল একটু দূরে আর একটা গাছের ডালে। একটা কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে এসে বসল। কা

কা করছে। ওর এই ডাকটাতে মনে হয় যেন বলছে, বেলা পড়ে আসছে উঠে পড়, উঠে পড়।

বাড়ির দিকে এবার হাঁটতে শুরু করি। গ্রামের শেষ প্রান্তে আমাদের বাড়ি। আমের বাগান জংলা গাছে ভর্তি হয়ে রয়েছে। বড় আমগাছটার ডালটা ভেঙে গেছে। বাড়িটাকে ঠিক মনে হচ্ছে যেন একটা পোড়ো বাড়ি। কেউ থাকে না। এই গাছটা তার একটা ডাল জানালার খুব কাছে নিয়ে এসেছিল। একা সাত আট বছরের কিশোর জানালা দিয়ে গাছটার পাতা ছুঁয়ে কথা বলত।

ফাল্গুনে কচি পাতার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মুকুল আসতো গাছটার ডালে ডালে। সারা বছর ধরে আসতো পাখিরা। পালা করে করে তারা গাছটার ডালে বাসা বাঁধত। শালিখ, ফিঙে, দোয়েল, টুনটুনি সব।

হাত বাড়ালেই গাছের ডালে পাখির বাসা। সেই কিশোর জানালা দিয়ে দেখতে পেত এক অসীম বিস্ময়ের জগত। দুচোখে আশা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে মা পাখি বাসায় বসে ডিমে তা দিত। একইভাবে কেটে যেত সকাল-দুপুর-বিকেল। পাখিটা বাসা থেকে একবারও বের হতো না। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা যেন ভুলেই থাকত। দিনের পর দিন এইভাবে কেটে যেত। তারপর একদিন পাখির ছানার চিঁচিঁ ডাক শোনা যেত। মা পাখি তখন খাবারের সন্ধানে বের হয়ে যেত। পাখির ছানাগুলো লাল ঠোঁটে কেঁদেই যেত, কেঁদেই যেত। মা খাবার নিয়ে ফিরলে ছানাগুলো ডানা মেলে গলা উঁচু করে ঠোঁট দুটো ফাঁক করত। মা পাখি তার ঠোঁট দিয়ে ওদের মুখে খাবার দিয়ে দিত। তারপর একদিন দেখা যেত বাচ্চাগুলোর ডানার পালকে রঙ এসেছে। ক'দিন পরই শক্ত হতো ডানা। উড়তে শিখতো ছোট পাখিগুলো। তারপর একদিন ওরা উড়ে চলে যেত। যে যার মতো দূরে চলে যেত ওরা। জন্মেছিল যেখানে সেই গাছটার কাছে কি ফিরে আসতো কোনও দিন?

সেই আমগাছ এখন বৃদ্ধ। ডাল ভেঙে গেছে। সেই বাগান এখন বুনো আগাছায় ভর্তি। সেই ঘর ভেঙে গেছে, পড়ে আছে একটা ধ্বংসাবশেষ। ওদিকে রাস্তার ধারে দুটো বাড়ি উঠেছে। একটা একতলা পাকা বাড়ি। আর একটা ইটের দেওয়াল টিনের চালের বাড়ি। এই ক বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে।

পাকা বাড়ির কোন একটা হয়তো দাদার বাড়ি। বড় কাকাকে দেখে খুব অবাক হলাম। অন্য কোথাও কেউ চিনিয়ে না দিলে চিনতেই পারতাম না। আগের সেই চেহারাই নেই আর।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ থাকলেন, তারপর দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, আমাদের তপু না?

পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন বড়কাকা। বললেন, ওরে তপু, সেই যে গেলি, একটা খবর পর্যন্ত দিলি না!

বড়কাকার চোখ বুঝি সজল হয়ে এল।

কী করছিস আজকাল?

মাথা নিচু করে বলি, ছাপার কাজ করি।

তা কি ছাপা হয়? কাগজ? না বই?

সব কিছুই।

বড়কাকা খুশি হলেন। বললেন, যাক, তুই শেষ পর্যন্ত মানুষ হলি। তোর বাবা দেখে যেতে পারলে খুশি হতো। তা হ্যাঁ রে কিরকম বেতন পাচ্ছিস?

যা পাই আমারটা চলে যায়।

তা বাপু তোর দাদা সব জমি জমা একে একে বেচে দিচ্ছে। ভদ্রাসনটা কোনওরকমে ঠেকেছে। তুই গাঁ ছেড়ে বেরিয়েছিলি বলে মানুষ হলি। আমরা আর কদিন আছি। এবার একটা বিয়ে কর। বউ দেখি। নাতি নাতনি দেখে যাই।

কাকিমা ভাল আছেন?

আর ভাল? গ্রামে আর ভদ্দরলোকের থাকা চলবে না। ক'ঘরই বা আর আছে? মল্লিকদের সবাই এখন টাটায় থাকে। রায়দের ছোট তরফ এখন কেবল আছে। বড়রা সবাই কোলকাতায়, কেউ জামাডোবায় থাকে। মরে ঝরে সব শেষ হয়ে গেল রে। দেব-দ্বিজে আর মানুষের ভক্তি নেই। এখন সব সিডিউলদের যুগ। দিন দিন সব প্রতিপত্তি বাড়ছে।

আরও অনেক কথা বললেন বড়কাকা। অনেক অভিযোগ করলেন। বড়কাকা একসময় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করেছেন। শ্রমিক ইউনিয়ন করেছেন। এখন সে কারখানার নাভিশ্বাস উঠেছে। অবসর জীবন এখন বড়কাকার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না। এখানে বর্গা আন্দোলন হয়েছে। ভূমিসংস্কার হয়েছে। বললেন, দেশ থেকে জোতদার জমিদার উপরে ফেলতে হবে বলে কংগ্রেসকে তাড়ালাম। কংগ্রেস স্কুল করেছে, রাস্তাঘাট করেছে, দেশটাকে স্বাধীন করেছে সেই কংগ্রেস চলে গেল। এল যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট। পঞ্চায়েত হল। জ্যোতিবসুর জমানা চলছে রমরমিয়ে।

চুপ করে শুনছিলাম। সাঁইত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লড়াকু শ্রমিক গ্রামে এসে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের প্যাঁচে পড়ে নাজেহাল হয়ে গেছেন। এত কথার মাঝে একবারও কড়ির কথা উল্লেখ করলেন না বড়কাকা, বোধহয় ভুলেই গেছেন মনে হল।

আমি যেদিন কলকাতায় গেলাম, সেদিন কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল কড়ি। তারপর স্বপনের সঙ্গে ওর বিয়ে হল। স্বপন কাটোয়ার দিকে একটা ইস্কুলের মাস্টার। থাকে ওখানেই। কড়ি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, গান জানে। ও পড়ে আছে গ্রামে শ্বশুরবাড়ির এক কোণে। শ্বশুরবাড়ির জল বাতাসে এখন কড়ি কেমন আছে জানতে ইচ্ছে করে।

কড়ি'র কথা ভাবতে ভাবতে ভারি হয়ে এল নিঃশ্বাস। মনে মনে বলি, স্বপনের সঙ্গে ও যেন ভাল, থাকে।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল। বড়কাকা বললেন, এবার একটা বিয়ে কর?

ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।

বিয়ের কথা? বল।

কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। হাজার হোক বড়কাকা গুরুজন।

বল না লজ্জা কিসের?

দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে বলে ফেললাম, বড়কাকা আমি বিয়ে করেছি।

বড়কাকা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। প্রথমটায় তিনি হাঁ হয়ে গেলেন। বোধহয় নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপর হাঁ বন্ধ করে বললেন, এ তুই কী বলছিস তপু?

ঠিকই বলছি।

তা বউমা কোথায়? বউমাকে নিয়ে এলি না?

না আনিনি। সে মুসলমান।

এ্যাঁ! বলিস কী রে?

বড়কাকা কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। দাওয়ার টিনের চালের তলায় তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। হাতপাখাটা তাঁর থেমে গেছে।

লভ ম্যারেজ করেছিস?

হ্যাঁ।

কী বললি? বউ মুসলমান?

হ্যাঁ।

তুই ধর্ম পরিবর্তন করেছিস?

না।

এ বিয়ে অসিদ্ধ।

কেন, অসিদ্ধ কেন?

মুসলমান মেয়ে ধর্ম পরিবর্তন করালি না? সই করলেই হল?

আর কী করা যেত?

এমনি বিয়েরেই কত হ্যাপা। তার ওপর বেজাত...

উঠি তা হলে বড়কাকা। বলে আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলাম।

থাক থাক বলে বড়কাকা পিছিয়ে গেলেন। বললেন, তুই কি কেবল এই কথা বলতেই এসেছিস?

হ্যাঁ।

উঠে পড়লাম। বাইরে এলাম। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। কথাটা না বললেই ভাল হতো বোধহয়। কাঁধের ব্যাগটা এখন ভারি লাগছে। থাকতে বলা দূরে থাক, বড়কাকা বসতেই বললেন না।

এখন কোথায় যাব ভাবতে লাগলাম।

সানের বাঁধানো ঘাটের পাশে বড় তেঁতুলগাছটার নিচে গিয়ে বসলাম। পাশে ব্যাগটা নামিয়ে রাখি। অলস দৃষ্টিতে গাছের ডালপালাগুলো দেখি। আগে গাছটা অনেক ঝাঁকড়া ছিল। ওপাশে প্রাইমারি স্কুলটার গায়ে বিরাট একটা তালগাছ ছিল। ওই গাছের তাল ছিল খুব মিষ্টি। ভাদ্র মাসে ঝড় বাদলের রাতে সবাই ভিড় করত ওই গাছের তলায়। একবার তো একটা বিরাট গোখরো মারা পড়ল ওই গাছের তলায়। বড় একটা ব্যাঙ খেয়েছিল, ব্যাটা নড়তেই পারছিল না। তালগাছটায় ছিল এক গাদা বাবুইপাখির বাসা, উল্টোনো কুঁজোর মতো ঝুলত। উড়ে উড়ে বাসা বুনত বাবুইপাখির দল। হাঁড়ি ভাঙা কটিংগুলো নিয়ে ব্যাঙ চচ্চড়ি খেলতাম। কারটা বেশি

দূর যায়। কত কথাই না মনে পড়েছিল। এসব ভাবতে ভাবতে কেমন মনে হল—কেন এখানে বসে আছি! আমার কি যাবার জায়গার কোনও অভাব আছে? এখনই তো দাদার বাড়ি যেতে পারি। ওখানে তো আমার নিশ্চিন্ত আশ্রয় বাঁধা। তাই কি?

উঠে পড়লাম। সোজা রাস্তা ধরে চলতে শুরু করি। ফিরে যাব? হামিদা দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে বটে। বলবে, এ কি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

ভাল লাগল না তাই।

হামিদাকে তো বলব। কিন্তু শোভনাকে কী করে বলব, আমি পারিনি। আমায় তুমি ক্ষমা করো।

কাঁধের ব্যাগ ক্রমেই ভারি ঠেকছে। মনে হল পথ চলা যেন আর শেষ হবে না। কোথায়ই বা যাব, কার কাছেই বা গিয়ে দাঁড়ব। রাস্তায় লোক চলাচল করছে। এরা কেউ আমায় চেনে না। সবাই যে যার মতো চলছে। সংসারে কেউ তো স্থির হয়ে বসে থাকে না। কিন্তু সবার লক্ষ্য কি শুধু পেট ভরানো? নিজের নিজের প্রয়োজন মেটাতেই কি সবাই ব্যস্ত?

বহুদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল—গ্রামের বুড়ো বটতলায় একটা তান্ত্রিক এসে বসেছিল। তখন সবে বাবা মারা গিয়েছেন। কিছুই ভাল লাগতো না। ঘুরতে ঘুরতে একদিন চলে গিয়েছিলাম ওই তান্ত্রিকের সামনে। লাল একটা আলখাল্লা জড়ানো তান্ত্রিকের গলায় ছিল বড় বড় রুদ্রাক্ষের একটা মালা। হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা। কাঁচা পাকা দাড়ি। মাথার থেকে একটা মোটা জটা নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। ফর্সা গায়ের এখানে ওখানে সিঁদুরের দাগ। কপালে ইয়া বড় একটা সিঁদুরের টিপ। চোখ দুটো ভাঁটার মতো লাল। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলেছিল, কি রে ব্যাটা কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছি। আজ তোর আসার সময় হল?

ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি আমাকে পুজো করা শেখাবে?

তান্ত্রিক বলেছিলেন, শেখাবো কি রে, তুই তো নিজেই একটা ঠাকুর রে!

ধ্যেৎ। আমি ঠাকুর হতে যাব কেন? বলেছিলাম আমি।

তান্ত্রিক হেসেছিলেন হা হা করে। ছোট একটা কাঁসার বাটিতে এক বাটি কারণ বারি সেবন করে বলেছিলেন, হবি হবি। আমার সঙ্গে চ তোকে দেখিয়ে দেব।

আজ এতদিন পর তান্ত্রিকের সেই কথাটার মানে বুঝতে পারলাম। সবাই নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যই বেরিয়ে পড়ে। নিজেকে না পেলে নিজের চেয়ে যে বড় তাকে পাবার কোনও উপায় থাকে না। ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেকটা মানুষ একটা লক্ষ্যে ছুটতে থাকে। এই ছোটাটা শুধুমাত্র তার নাওয়া খাওয়া আর কাজ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে এমন এক আত্মসত্তাকে খোঁজে, যে তার বর্তমান, তার অতীত, তার প্রবৃত্তি, তার বাসনাকে ছাড়িয়ে আরও দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। নিজেকে জানার জন্যই সবার এই সাধনা। তাই তো কবি লিখেছেন, আপনাকে জানা আমার ফুরাবে না। সঞ্জয়, শোভনা, পৃথা, হামিদা, মোতি সাহেব সকলেই সেই উদ্দেশ্যেই চলেছে। এমন কী আমিও।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হতে চলল। রোদের তেজ বেড়েছে, কিন্তু তবু কোনও কষ্ট হচ্ছে না। কাঁধের ব্যাগ ক্রমশ বড় হাল্কা হয়ে গিয়েছে। হাল্কা হয়ে গিয়েছে শরীর।

খিদে নেই, তেষ্টা নেই—এক অপার্থিব আনন্দে হেঁটে চলেছি। বিরাট একটা ঝিল। বাজবাড়ির ঝিল এটা। মজে গিয়েছে, অনেক পদ্ম ফুটে আছে। কটা বক একমনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে চেয়ে। টিপ করেছে মাছ ধরবে বলে। মনে হল আমিও তো এরকম প্রবৃত্তির তাপে, বাসনা কামনার বেগে ছুটে চলেছি এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। কাউকে কিছু দিইনি, কিছু পাইওনি। হঠাৎ যেন সংযত হয়ে এল মন। যেন সমস্ত জানা একটা পরম প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়ে এসেছে। যেন সমস্ত বাসনা একটি পরম প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চাইছে।

পথের ছাওয়া ঘন হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে পড়ল ফড়িং এর বাবাকে তো কিছু দেওয়া হয়নি, আমার দেওয়া উচিত। আবার পিছনে ফেরা। বাড়িটা কি খুঁজে পাব? ঘন সবুজ পাতার জঙ্গলে নীল সাদা অপরাজিতা ফুলের সমারোহ খুঁজে ফিরি। বেড়ার আড়াল থেকে আমাকে চমকে দিয়ে একটি তরুণী বধূ বেরিয়ে এল।

কপাল পর্যন্ত ঘোমটা, সবুজ ডুরে শাড়ি, কালো নয়, স্নিগ্ধ শ্যামল রঙ, লাবণ্যে ভরা মুখখানি, মায়া ভরা টানা দুটি চোখ। সুন্দর সুরেলা গলায় বললে, কাকে খুঁজচ গো?

ফড়িংদের বাড়ি। ... শোভনা—

বধূটি তার কোমল চোখের মৃদু ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

সবুজ সতেজ তেলাকচু'র ঝোপের পাশ দিয়ে এগিয়ে একটা ফুটো খড়ের চালের বাড়ি। উঠোনের একপাশে নয়নতারা ফুলের ঝোপ, এক পাশে গাঢ় সবুজ পুঁই-এর মাচা। তুলসীমঞ্চ মাঝখানে। চারপাশে কাঁটানটের জঙ্গল। বধূটি দাঁড়াল।

ছিটে বেড়ার দেওয়াল। একটা ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর।

কুঁড়ের চাল দেখা যায় না, লতাপাতায় ছেয়ে গেছে। উঠোনেই অনেক লতানে গাছ। গত রাতে এখানে থেকেছি। অথচ এসব কিছুই দেখিনি।

বধূটি ঝোপঝাড় পেরিয়ে সেই কুঁড়েঘরে উঠে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে বলল, বাবার খুব জ্বর এয়েচে, মাতা তুলতে পারচে নে।

দেখা হবে না তাহলে?

দেখি বুড়ো কুঁড়ের ছোট ঘরের দরজাটার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

জ্বরের তাড়সে ওর চোখ দুটো ছলছল করছে।

বুড়োর হাতে টাকাটা তুলে দিতে, বুড়ো কোনও কথা বলতে পারল না। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল আর দুটো চোখ জলে ভরে গেল। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না।

কুঁড়ের উঠোনের গাছপালাগুলো পেরিয়ে এসে সেই বধূটিকে আর দেখতে পেলাম না। শুধু গাছপালা, লতাপাতা। দূরে বড় গাছপালার ফাঁকে নীল আকাশ উঁকি দিল।

পিছনে বুড়োর গলা শুনতে পেলাম—অ বউ, বউ, কোথায় গেলি? ওকে বসা! ও যে আমাদের তপু রে! বউ, অ-বউ, কোথায় গেলি?

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম তেমনিই আবার হাঁটতে থাকি। জন্মভিটেকে পিছনে ফেলে এগোই নিঃশব্দে। একবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে জন্মভিটেটার দিকে ফিরে তাকাই। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা অধীর আবেগে আছাড়ি পাছাড়ি করে। উঃ অসহ্য এ যন্ত্রণা!

বুকটা চেপে ধরি। ধীরে ধীরে গ্রামের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম যেপথ

দিয়ে এসেছি সেই পথে। পিচ উঠে যাওয়া পুরনো পথে ধীর পায়ে ফিরে চলি। যেতে যেতে খুব স্পষ্ট শুনতে পেলাম ঠাকুমার গলার স্বর। আবার কবে আসবি তপু? ভুলে যাস না যেন!

দাঁড়াই। পিছন ফিরে দেখি। কই না! কেউ কোথাও নেই তো?

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের গাছপালাগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে যেন গভীর শোকে নিস্তব্ধ মলিন হয়ে। বড় কষ্ট! এই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি শেষবারের মতো। কতদিনের কত স্নিগ্ধ শান্তিময় স্মৃতি বিজড়িত—বড় আদরের, বড় ভালবাসার এই গ্রাম! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এখানে গ্রথিত প্রোথিত হয়ে আছে। এ সবই ছেড়ে চলে যাচ্ছি। জানি না কোন অপরাধে আমার এই নির্বাসন!

বহুকষ্টে নিজেকে শান্ত করি। নাঃ। কারও উপরে আমার কোনও অভিমান নেই। নিজের তপ্ত যন্ত্রণার জ্বালায় নিজেই জ্বলি। কারও প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। আমার ভাগ্যের ফল আমাকে ভোগ করতে হবে, এই বলে নিজেকে সামলাই।

বিয়ের পর আবার অফিস থেকে ছুটি নিতে নর্মদাবাবু অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনি তো ছুটি নেন না। তা কোথায় যাবেন, কোথাও বেড়াতে?

না অনেকদিন দেশের দিকে যাওয়া হয়নি।

তা বেশ তো ঘুরে আসুন। আপনাদের মতো কর্মীদের আর কত টাকাই বা দেয় কোম্পানি, পাওনা ছুটি নেবেন বইকি!

সে আপনি আমাকে ভালবাসেন বলে।

আপনি তো মশাই ছুটিই নেন না। দেখি আমার এক বন্ধু নতুন একটা কর্পোরেট হাউসে যোগ দিয়েছে। ওদের একটা নতুন কাগজ বের হবে বলছিল, ভাল ডিটিপি অপারেটর চাই। আপনার কথা বলেছিলাম, ওখানে ঢুকতে পারলে আপনার মতো কর্মীর উন্নতি হবে।

কোন কাগজ?

বাংলা খবর?

বাংলা খবর। এরকম একটা নাম শুনেছি বলে মনে হল। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়া হয় না বটে তবে নামটা খুবই জানা বলে মনে হচ্ছিল। এরকম একটা জায়গায় চাকরি পেলে মন্দ হয় না।

নিজের মনের গভীরে চেয়ে দেখি সেখানে কে আছে? সেখানে কি হামিদা নেই? যা আপাত বিচ্ছেদ বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা পরম পাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। সেই এক লক্ষ্যে যেখানে শুধু হামিদাই রয়েছে। এতদিন কাকে চেয়ে এসেছি? চেয়ে এসেছি ভুল করে, ভুল ভেঙে যাকে পেয়েছি সেই বুঝি পরম পাওয়া বলে মেনে নিয়েছি। এ কি নিজেকেই জানার সাধনা? পৃথাও বুঝি এমনি করে নিজেকেই চেয়ে এসেছিল?

শিয়ালদহে এসে কেমন যেন ধাঁধা লাগল। ভিড় করে আছে অজস্র মানুষ। অনেক পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে। লাইনের ওপর ভিড় করে আছে দু আড়াইশো লোক। ট্রেনগুলো ফাঁকা, পরপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন কে জিজ্ঞেস করলাম—এ সব কী ব্যাপার গো?

একজন বললে, ট্রেন চলবে না।

কেন?

দেখছ না, সবাই লাইনে বসে আছে।

বড় ঘুম আসছিল, কী করব, কোথায় যাব, ট্রেনের ফাঁকা একটা কামরায় উঠে পড়লাম। দেখি আমার মতোই দু একজন বসে। একজনকে বললাম, যদি আমার ঘুম না ভাঙে—আমাকে ডেকে দেবে ভাই!

লোকটা বললে, তা ঘুমাও না!

কিন্তু সে ঘুম চিরকালের ঘুম হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুপদুপ করে বুটের শব্দ এল। কারা যেন ট্রেনের কামরাগুলো ভাঙতে লাগল। আমি বোধহয় প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন দিক থেকে যে একটা অদৃশ্য হাত এসে আমাকে আঘাত করে শুইয়ে দিল টের পেলাম না।

টের পেলাম কয়েকদিন পরে। জ্ঞান হলে দেখলাম হাসপাতালে শুয়ে আছি। হাসপাতালে কী করে এলাম, এ সব ভাবতে ভাবতে কেমন যেন তলিয়ে গেলাম। মাথায় পুলিশের লাঠি পড়েছিল। কিন্তু হামিদা কোথায়? সে কেমন আছে? আজ ক'তারিখ? এসব ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে ছুটি চাইলাম। ওরা আমাকে ছাড়তে চাইছিল না। আমি নাকি ভীষণ দুর্বল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে নাকি মাথা থেকে। জোর করে ছুটি নিলাম। শরীরে একটা আড়ষ্টতা লাগছিল। রাস্তায় অনেক মানুষের মাঝে এসে হাঁপ লাগছিল। তবু ভাল লাগছিল চলমান মানুষের মিছিল। এই তো সেদিন একটা ছেলে গ্রাম থেকে এসে উঠেছিল এই শহরে। এমনি কত স্বপ্ন নিয়ে কত জন এসে নামছে শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন কেউ কি তার খোঁজ রাখে?

কে যেন বলল, দাঁড়িয়ে থেকো না, হাঁটো। তোমাকে যেতে হবে অনেক দূর। দাঁড়ালেই থমকে যাবে। হাঁটো, নিজেকে চেনো, নিজেকে জানো।

কী ব্যাপার আপনি?

দেখি নর্মদাবাবু সামনে দাঁড়িয়ে। আমার চেহারা দেখে নর্মদাবাবু অবাক হয়ে গিয়েছেন।

আপনি সেই ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি না কোথায় গিয়েছিলেন না? তা এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে! কী ব্যাপার বলুন তো?

শ্বশুরমশাই মারা গেলেন। তারপর একটু দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম।

তা মশাই অফিসে বলে যাবেন তো? এ কী আপনার সরকারি চাকরি যে ইচ্ছে হল আর ডুব দিলেন?

আমার চাকরিটা আর নেই না নর্মদাবাবু?

তাই থাকে নাকি! আচ্ছা আহম্মক তো আপনি! তা ছাড়া ওই অফিসে এখন অনেক গোলমাল।

কী হয়েছে?

সে সব অনেক কথা। পরে শুনবেন। আমিও ও অফিস ছেড়ে দিয়েছি। ভাল কথা, খবরের কাগজের চাকরিটা করবেন? বেশি মাইনে কিন্তু দেবে না। যদি বলেন, তাহলে দেখতে পারি।

কী যে বলেন, নিশ্চয়ই! কোথায়?

এই রাজাবাজারে।

এই কার্ডটা নিন। একদিন গিয়ে এখানে দেখা করুন। আমি বলে রাখব। পরে কথা হবে বলে নর্মদাবাবু হনহন করতে করতে চলে গেলেন। আমার হাতে বাংলা খবরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদকের নামের কার্ড।

শ্যামাপদ তাহলে আমকে ডোবালো? ও তো বলেছিল, বড়কর্তা আমাকে ভাল চোখে দেখেন। আমার কোনও ভয় নেই। যতদিন কাজ করেছি শ্যামাপদ আমার কাছে মাথা হেঁট করে কাজ করে গেছে। পেটে পেটে তার যে এমন শয়তানি ছিল এখন বুঝলাম।

একবার অফিসটা গিয়ে দেখতে হবে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। সূর্যিপুরের জলগুলোকেও দেখতে পাচ্ছি না। পাশে দুজন লোক বসে আছে। ওদের হাতে জলের বোতল রয়েছে ওদের কাছ থেকে চেয়ে খাওয়া অবশ্য যায়। কিন্তু চাইব? ভাবতে ভাবতেই ওপাশের একজন ট্রেনে উঠে অবলীলায় একজনের কাছ থেকে চেয়ে ওদের বোতলের জল অনেকটাই খেয়ে নিল।

এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। একজনের কাছে জল আছে, আর একজনের তেষ্টা পেয়েছ। সে জল চাইবে খেতে। তবু কেন আমি চাইতে পারছি না! বাড়িতে অনেক খালি বোতল আছে, কিন্তু বাইরে বের হবার সময় তার একটাতে জল ভরে নেবার কথা কিছুতেই মনে থাকে না।

অসহ্য গরম। গাড়ি চলার সময় একটু আরাম হয় কিন্তু প্ল্যাটফর্মে থেমে থাকা গাড়িতে বসে যেন আগুনে সেদ্ধ হচ্ছি।

পাশে বসা লোক দুটো আমায় চেপে ধরেছে। ওদের গা থেকে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ নাকে আসছে। গাটা গুলিয়ে উঠল। সময় যেন কাটতেই চাইছে না। পৃথিবীতে কত রকমের মানুষ আছে। তবু ট্রেনের কামরার এই মানুষ দুজনকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। সহযাত্রী সেরকম কেউ নেই যে আলাপ করব। একজন ওপাশ থেকে প্রাথমিক আলাপের চেষ্টায় আমার কাছ থেকে শুধু হুঁ আর না উত্তর পেয়ে নিবৃত্ত হল। এখন ওরা নিজেদের মধ্যে চাকরিতে গোল্ডেন হ্যান্ডসেক, অবসরের বয়স ষাট বছর কেন, কম্পিউটার কেন আনা হল এদেশে এসব নিয়ে আলোচনায় মেতে গেছে। আমি বুঝতে পারি ওদের বেশির ভাগ কথাই ভুল। অবশ্য আমিও যে পণ্ডিত, তা নয়। তবু কেউ ভুল বললে তার গলার আওয়াজ শুনেই অনেক সময় টের পাওয়া যায়। আর আশ্চর্যের ব্যাপার কোনও একটা বিষয় সম্পর্কে খুব কম জেনে কেবলমাত্র বাঙালিরাই বোধহয় অনেকক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। এটা বাঙালি চরিত্রের একটা বোধহয় বিশেষত্ব।

ওমা, তুমি? এ কী চেহারা করেছ? চমকে ঘুরে দাঁড়ায় হামিদা। সামনে আসে। আমার গায়ে হাত দিয়ে তাপ দেখে।

- কোথা থেকে আসছ? দেশে যাওনি তুমি?

হ্যাঁ। একটু জল খাওয়াবে?

অমন করে বলছ কেন? হামিদা দৌড়ে জল আনতে গেল।

জল খেয়ে হামিদাকে দেখি। কী অপূর্ব লাগছে ওকে। প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিলাম, সেই রূপ তেমনি অটুট, তেমনি উজ্জ্বল। মাথার সোনালি চুল গায়ে দুধসোনা আলো ফেলেছে। যেমন গড়ন তেমন স্বাস্থ্য। সত্যি যেন লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। এই দুদিনে বয়স আরও কমে গিয়েছে। দুঃখে কষ্টে ওর রূপ যেন আরও খুলেছে। বিষন্ন চোখে আমায় দেখে।

আমি হাসি।

তোমার কী হয়েছে গো?

হামিদার সন্দেহ যায় না।

আমি হাসি। হামিদা হাসে খুব আলগাভাবে। আলগা। কিন্তু ধারালো খুব। চেহারায় বিষণ্ণতা তবু হাসির ভঙ্গিটা ওর এখনও আগের মতোই। হাসি বা কান্নার চেহারা বোধহয় বদলায় না কখনও। সব বয়সে, সব অবস্থাতেই হাসি বা কান্নার রূপ একই রকম। বিয়ের দিন যে ছবিটা তোলা হয়েছে, সেই হাসির সঙ্গে এই হাসির তফাত নেই কোনও।

দেশের সকলে কেমন আছে?

বাড়ির কারও সাথে দেখা হয়নি।

কেন? তাহলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

দেশে গিয়েছিলাম। তবে বাড়ির কারও সাথে দেখা করিনি।

তা হলে গেলে কেন?

গেলাম একটা ঝোঁকের বসে।

ঝোঁক? তাহলে বাড়ির কথা মন থেকে মুছে ফেলা উচিত।

উচিত অনুচিত জানি না। ইচ্ছে করলেই কি সব মুছে ফেলা যায়?

যায় না? মানুষের অসাধ্য কিছু নেই বলেই তো শুনেছি। চেষ্টা করেই দেখ না?

চেষ্টা করলেই যদি ভোলা যেত তাহলে তো এ সংসারে এত দুঃখ কষ্ট থাকত না। আমাদের হিন্দুদের এক দেবতার নামই হচ্ছে ভোলানাথ। সব কিছু ভোলবার জন্য তাকে ভাঙ খেতে হয়। ভাঙ খেয়ে তিনি সমস্ত বিশ্ব সংসার ভুলেছেন। ভুলতে পারেননি পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতীর আত্মাহুতি। সতীর মৃতদেহ নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করেছেন।

তুমি কি সত্যি ভুলতে চাও?

হ্যাঁ। সত্যি আমি ভুলতে চাই। আমি আর পারছি না। সব কিছু আমার অসহ্য লাগে।

ভুলে যাও। ভুলে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করো। এ চেষ্টায় কোনও ফাঁক রেখ না। কোথাও শিথিল করো না। যেমন তুমি বলতে পারো আমাদের সংস্কার সম্পর্কে। কিন্তু মন যা চায় তা তো পশুতেও করে। তাহলে মানুষের বৈশিষ্ট্য কোথায়? সংযম, সাধনা, শৃঙ্খলা এসবই তো মানুষের জন্য।

হামি, আমার ভাল লাগছে না। আমি একটু ঘুমুবো।

যাও। যাও। এখন আমাকে তোমার ভাল লাগছে না।

হামিদা সরে গেল। আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে।

দুচোখে আমার ঘুম নেমে আসছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে জানলাম-রাত্রে হামিদার খুব জ্বর এসেছে। এখনও জ্বরে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। কাকে ডাকি, কী করি—ভেবে অস্থির হই। হু হু করে জ্বরে কাঁপছে হামিদা। বাধ্য হয়ে সুলতানাদের বাড়ি গেলাম। ওর বাবা সেই নবীন ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ডাক্তারের সঙ্গে হামিদার কাছে এলাম। ডাক্তার হামিদাকে পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে উঠে পড়লেন। বাইরে আসতেই সুলতানার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কী রকম বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

গম্ভীরভাবে ডাক্তারবাবু বাইরে এসে বললেন, আধ ঘণ্টা পরপর একটা ইঞ্জেকশন চলবে ছটা। ওষুধগুলো তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিন। আমি আবার ও বেলায় আসব।

সুলতানা হামিদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, যন্ত্রণাচ্ছন্ন হামিদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, খুব লাগছে? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে? একটু ধৈর্য ধর, ওষুধ পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

মাথা নেড়ে নেড়ে হামিদা বলে, বুকে, এই বুকে। সুলতানার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে। ওর কষ্ট দেখে সুলতানাও রুদ্ধস্বরে কেঁদে ওঠে। আমার বুকের ভিতর থেকে দলা পাকানো একটা ব্যথার চাপ বাইরে আসার চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে বাইরে আসি। সুলতানার বাবাকে কিছু বলার চেষ্টা করি। পারি না। উনি আমার অবস্থা দেখে বলেন, আহা, অত ভেঙে পড়ছ কেন বাবা। আমরা তো রয়েছি। দাও প্রেসক্রিপশনটা দাও। বলে উনি ওটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। সুলতানা আমায় কী যেন বলতে এল। আমি বললাম, আপনারা সবাই রইলেন। ওকে দেখবেন। আমি একটু অফিস ঘুরে আসি আজ।

অফিসে গিয়ে দেখি, চেনবার উপায় নেই। সিঁড়ির পাশে, দেওয়ালে অফিসের ভিতরে পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। লাল, নীল কালিতে বড় বড় হরফে বিভিন্ন স্লোগান লেখা, আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে অফিস বন্ধ হবে। স্ট্রাইক হবে। এমন ধরনের পোস্টারে অত সুন্দর অফিস বাড়িটা নোংরা হয়ে রয়েছে। সব থেকে অবাক হয়ে গেলাম দেখি, অফিসে যারা রয়েছে তাদের বেশির ভাগ লুঙ্গি গেঞ্জি এসব পরে আছে। অফিসের এরকম চেহারা এর আগে আমি কোনও দিন দেখিনি। আমাকে দেখে সবাই একটু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

শুনেছিলাম অফিসে একটা কিছু হতে চলেছে। কিন্তু তার চেহারাটা যে এরকম আমার কোনও ধারণা ছিল না। ভেবেছিলাম ইউনিয়ন একটা দাবি দাওয়ার তালিকা পেশ করবে। বারগেইনিং হবে, নেগোশিয়েশন চলবে, তারপর একটা ফয়সালা হবে। কিন্তু তার বদলে এসব কী? সমস্ত অফিসের চেহারাটাই বদলে গেছে। কোনও কাজ হচ্ছে না, অথচ প্রায় সকলেই অফিসে হাজির। এ যেন অফিস নয়, সবাই বসে আছে নিজের বাসায়।

আমার বসার জায়গাটায় গিয়ে বসি। বুঝতে পারি, অনেকগুলো প্রশ্নবোধক চোখ জিজ্ঞাস্য নিয়ে আমার চারদিকে জেগে আছে। দু একটা বিদ্রূপ ভরা মন্তব্য কানে এল। ফ্যাসফেসে গলায় কে যেন বলে উঠল, উনি তো বড়কর্তার চামচে, তা এখানে কেন? উনি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?

কিছু পরে বড়কর্তা আমাকে ডেকে পাঠালেন। এতে আমি আরও অবাক হলাম। গিয়ে দেখি তিনি অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন চেম্বারের ভেতরে। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। ছাই ফেলতে ভুলে গেছেন বুঝি, আপনা থেকেই ঝরে পড়ল কার্পেটে।

আমাকে দেখে একটু থামলেন। ওর মুখ খুবই অপ্রসন্ন আর উত্তেজিত দেখলাম। রুদ্ধ ঘরের ভেতরে ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন শুনব বলে কান পেতে আছি। তিনি বললেন, অফিসটার চেহারা দেখেছো? ছি ছি ছি! ডেকোরাম বলতে কিচ্ছু নেই। গেঞ্জি গায়ে অফিস না করলে কি দাবিদাওয়া পেশ করা যায় না? যতসব অশিক্ষিত গেঁয়ো ভূত!

বলে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কী বলা উচিত ঠিক করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলি, স্যার আজ আমি জয়েন করলাম। অনেকদিন ছুটিতে ছিলাম।

বড়কর্তা ভেনেসিয়ান ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। না ঘুরেই বললেন, হ্যাঁ। আমার জানা আছে। এও জানি যে তুমি ওদের সঙ্গে নেই। থাকতে পারো না। এমন বর্বরোচিত কাণ্ডকারখানার সাথে কোনও রুচিসম্পন্ন মানুষের সংযোগ থাকতে পারে না। ওরা অবশ্য তোমাকে দলে টানতে চেষ্টা করবে। দেখাতে চাইবে সবাই একজোট হয়েছে। তুমি অবশ্য ঘাবড়ে যেও না। পরিষ্কার বলে দেবে এসবের মধ্যে তুমি নেই। ভদ্রভাবে দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনায় নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু এই জংলিপনায় কখনও না। তোমার কোনও অসুবিধা হলে আমায় বলবে সরাসরি।

চুপ করে থাকার পর এবারে বললাম, আপনি বসুন স্যার। মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে লাভ কী? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন এটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেলা দরকার।

বড়কর্তা এবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন। তারপর রাগের স্বরে বললেন, নিষ্পত্তি নিশ্চয়ই করতে হবে। বাট নট্ অন দেয়ার টার্মস। কী পেয়েছে ওরা? ওদের সব দাবি মেনে নেওয়ার মানে জানো? কোম্পানিকে চাটি-বাটি গুটিয়ে দিতে হবে। কোম্পানি উঠে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি, এসব বিষয়ে আমি ভাল বুঝি না স্যার। তা ছাড়া চাকরির অভিজ্ঞতাই বা আমার কতটুকু! সত্যি বলতে কি আমি বেশ ভয় পেয়ে গেছি।

বড়কর্তা আমাকে আশ্বাস দেওয়ার মত করে বললেন, না ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। ওদের কোনও কথায় কান দিও না। চুপচাপ কাজ করে যাও।

বেশ চিন্তিত মুখ নিয়ে বড়কর্তার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। কাচের ঘেরাটোপের ভেতর নিজের চেয়ারে বসবার আগে বুঝতে পারলাম অন্ধকার রাতে একদল নেকড়ের চোখ যেমন জ্বলে সেরকম আমার আশেপাশে অনেকগুলো চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে চোখে অভিযোগ ঘৃণা, হতাশা আর আবেদন সব মিলে মিশে একাকার।

লাঞ্চ আওয়ারে একটু চা খেতে যাব বলে উঠব ভাবছিলাম। হাসনাত এসে দাঁড়াল সামনে। চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, ছুটিতে ছিলেন, আরও

কিছুদিন ছুটিতে থাকলেই তো ভাল করতেন। ঝামেলা বাড়াতে এখনই জয়েন করলেন কেন? এখন দেখুন সবাই বড়কর্তার সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধেও লাগবে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, আমার বিরুদ্ধে কেন?

হাসনাত কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বললো, সবাই ধরে নিয়েছে আপনি আমাদের সঙ্গে নেই। আপনি বড়কর্তার লোক।

হেসে ফেলি। বলি, কী করে বুঝলেন যে আমি আপনাদের সঙ্গে নেই? জামা খুলিনি বলে?

না তা নয়।

হাসনাতও হাসল। হাসনাত হামিদার দুর সম্পর্কের ভাই। বড়কর্তা হামিদার বাবা মোতি সাহেবের বন্ধু। এই অফিসে আমার আসার যোগসূত্র এটা। হাসনাতও এভাবেই এসেছে।

না তা নয়। হাসনাত হেসে বলে, একটা ধারণা আর কী। মানে প্রথম থেকে আপনার সম্বন্ধে যে ধারণাটা হয়ে গেছে সেটা আর বদলায়নি।

যাক সত্যি কথাটাই বলেছে। শুনে আমি গম্ভীর হয়ে বসলাম। আস্তে করে বললাম, মানুষের বাইরেটাই কি সব? মনে মনে তো আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি।

হাসনাত শুনে গম্ভীর গলায় বলল, জানেন? ঠিক হয়েছে আরও সাত দিন এরকম চলবে। তারপরও যদি বড়কর্তা আলোচনায় না বসে, স্ট্রাইক হবে। আমরা বাধ্য হব স্ট্রাইক করতে।

স্ট্রাইক! ধর্মঘট! চমকে উঠি। সবে বিয়ে করেছি। হামিদার শরীর খারাপ। এর মধ্যে স্ট্রাইক!

হাসনাত মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ। ইউনিয়নের সেটাই সিদ্ধান্ত। তখন আপনি কী করবেন? স্ট্রাইকে যোগ না দিলে, ওরা আপনাকে রীতিমতো অপমান করবে। এমন কী, ফিজিক্যালি অ্যাসাল্টও করতে পারে। আমি তাই বলছিলাম, আপনি আবার ছুটিতে চলে যান। ঝামেলা মিটে যাক্, তারপর আসবেন।

বড্ড চা তেষ্টা পেয়েছে। অন্য সময় হলে এখানে কাউকে দিয়ে আনানো যেত। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। শুকনো মুখে হেসে বলি, এত ঘন ঘন ছুটি চাইলেই বুঝি পাওয়া যায়!

হাসনাত চিন্তিত মুখে উঠে গেল। আমিও চা খাবার জন্য উঠে পড়লাম।

বাড়ি এসে দেখি হামিদা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আবার জ্বর এল কখন?

হামিদা কোনও উত্তর দিল না। দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও চুপ করে রইলো।

থার্মোমিটার ঝাড়তে ঝাড়তে সাবিত্রী ঘরে ঢুকল। বলল, দিদি ফিরে শোও।

ওর কথা হামিদা কানে তোলে না। এপাশ ওপাশ করে। উঃ আঃ বলে। সাবিত্রীর কথা হামিদা গ্রাহ্য করছে না দেখে বলি, ফিরে শোও না!

হামিদা বিরক্ত হয়ে ফেরে। সতেজে বলে, দাও।

সাবিত্রী থতমত খায়। থার্মোমিটার দিয়ে হামিদার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। হামিদাকে মৃদু ভাবে বলে, একটু শান্ত হয়ে শোও।

ওর এই কথায় হামিদা জ্বলে ওঠে। বলে, আমি কি সাধ করে চেঁচাচ্ছি? আমার যা হচ্ছে তা আমিই জানি।

সজোরে সে সাবিত্রীর হাত ঠেলে সারিয়ে দেয়। নিজেই থার্মোমিটার চেপে ধরে উঠে বসে। চোখ বুজে নিঃশ্বাস নেয়। জ্বরের ঘোর এখনও আছে। চোখ বড়বড় করে হামিদা বলে, তুমি আমার কাছে আসবে না। আমার কোনও কাজ করবে না।

সাবিত্রী থার্মোমিটারটা খুলে নিয়ে আমার হাতে দেয়।

সশব্দে হামিদা আবার শুয়ে পড়ে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। বুঝতে পারি সাবিত্রীর প্রতি হামিদার এই তিরস্কার আসলে সবই আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত। আত্মসম্মানে ভীষণ আঘাত লাগে। তবু নীরব হয়ে থাকি। এসব সহ্য করার অভ্যেস হয়ে গেছে। তিরস্কৃত সাবিত্রী সভয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করে, পারাটা কি খুব উঠে গেছে?

ঝাঁঝিয়ে ওঠে হামিদা। বলে, যাক উঠে। যা হবার আমার হবে, তোমার না।

ধমক খেয়ে সাবিত্রী চুপ করে যায়। গায়ে পড়ে ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া করছে হামিদা। করুণ দৃষ্টিতে হামিদাকে দেখে থার্মোমিটারটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বোঝবার চেষ্টা করে। সবিস্ময়ে বলে, ও বাবা, এ যে অনেক মনে হচ্ছে। কত হবে দাদাবাবু?

বলি, একশো পাঁচ, কিন্তু গায়ের উত্তাপে—

হ্যাঁ। এই রকমই হবে। বলে, পাশ ফিরে শোয় হামিদা। অসুখটা বাড়লেই ওর যেন ভাল। এরকম মনোভাব। বলে, আমি মলে অনেকে খুশি হবে।

সাবিত্রী ওকে আশ্বস্ত করতে চায়। বলে না না অত জ্বর হবে না। ভুল দেখেছেন, আর একবার থারমিটার দেব?

হাঁ আমি ইচ্ছে করে জ্বর বাড়াচ্ছি। হামিদা চিৎকার করে ওঠে। বলে, যত দোষ সবই আমার, বেশ তাই। তোমরা আর আমাকে জ্বালিও না। চলে যাও সব। কাউকে আমার কাছে থাকতে হবে না। উঃ আঃ, আব্বা! তুমি আমাকে একলা ফেলে চলে গেলে! কাঁদে হামিদা।

এ সময় আনোয়ার সাহেব ঘরে ঢুকলেন। ওঁকে আসতে দেখে সাবিত্রী চেয়ার এগিয়ে দিল।

কত জ্বর দেখলে মা? আনোয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

সাবিত্রী উত্তর দেবার আগেই হামিদা বলে, একশো পাঁচ। আপনি এখনি ডাক্তার ডেকে আনুন, আমি আর বাঁচবো না। আনোয়ার সাহেব অবাক হয়ে সাবিত্রীর দিকে চাইলেন। সাবিত্রী ইশারায় জানাল, জ্বর তেমন কিছু নয়। আনোয়ার সাহেব আশ্বাস পেয়ে হামিদার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, বেশ মা আমি এখনি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।

সাবিত্রী বলল, জামাইবাবুকে বলব, ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে?

হামিদা বিরক্ত হয়। কটমট করে তাকিয়ে বলে, ডাক্তার আসুক। এসে বলুক কতক্ষণে মরবো?

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সাবিত্রী মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। সাবিত্রী

ঘরের বাইরে গেলে আনোয়ার সাহেব বলেন, তুই ভীষণ বদরাগী মা। একটুতেই রেগে যাস।

হামিদা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, আমি বদরাগী। আর আপনারা সবাই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ।

কথায় কথা বাড়ে। আনোয়ার সাহেব তাই চুপ করে গেলেন। অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর কী করা উচিত ঠিক করতে না পেরে খবরের কাগজটা টেনে চেয়ারে চেপে বসলেন।

হামিদার আপত্তি টেঁকে না। ডাক্তার আসে, ওকে পরীক্ষা করে। থার্মোমিটারে জ্বর দেখে একশো দুই। ডাক্তার চলে যায়। আনোয়ার সাহেব এবার মুখ খোলেন, পাঁচ জ্বর কে বল্লে? এ তো মোটে দুই।

হামিদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, কে জানে ওরাই তো বলছিল।

কথাটা সাবিত্রীর কানে গেল। সে ক্ষুব্ধ হল। ঝগড়া করা তার স্বভাব নয়। হাসি খুশি হামিদার এই পরিবর্তন ওর ভাল লাগে না। কয়েকদিন ধরেই হামিদার ক্রুর দৃষ্টি এবং কঠোর আচরণ দেখছে সাবিত্রী। মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছিল। তবু ধৈর্য ধরে নির্বিবাদে সব সহ্য করে যাচ্ছিল। আজ যেন সবার উপরে হামিদা সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে। বিশেষত ক'দিন ধরে সাবিত্রী স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে হামিদা তার প্রতি একটা বিদ্বেষ ভাব আর গোপন রাখছে না।

এসব ক্ষেত্রে আমার কোনও ভূমিকা থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। পরের দিন অফিসে ঢুকতেই বড়কর্তার দেখা পেলাম। ওঁর চেম্বারে ডেকে নিলেন। সুযোগ পাওয়ায় সব কথা খুলে বললাম। বড়কর্তা সব শুনে টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, হোক স্ট্রাইক। আমি দেখব ওদের কোমরের জোর কত। যতটুকু মেনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে মেনে নিয়েছি। আর নয়। কেউ ভয় দেখিয়ে, ব্ল্যাকমেইল করে আমাকে দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে নিতে পারবে না। কেউ না আসুক অফিস ঠিকই চলবে। তুমি আসবে। আমরা দুজনেই চালিয়ে যাব প্রয়োজনীয় কাজগুলো। দেখি জল কতদূর গড়ায়।

ওঁর সামনে বসে ঘামতে থাকি। আমার হাতের আঙুলগুলো ভিজে যায়। খুব নার্ভাস লাগে।

বড়কর্তা আমার দিকে তাকিয়ে গভীর বিশ্বাসে বলেন, জানি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। অন্তত একজন লয়াল কর্মচারী এই অফিসে আমার আছে।

সেদিন অফিস থেকে বের হবার পর সবাই আমাকে খুব নাস্তানাবুদ করল। বিদ্রূপভরা স্বরে আমাকে অনেক কথাই শুনতে হল। বড়কর্তার ঘরে বসে সারাদিন কী করলেন? এসব আমরা বুঝি। দুজনে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছেন? ফল কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

রাগে থরথর করে কেঁপে উঠি। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলি, আপনারা কী ভেবেছেন বলুন তো?

অনেকগুলো মিলিত কণ্ঠের হাসির আওয়াজ পিছনে মিলিয়ে যায়। বাসস্টপে আমার বাস এসে গেছে। উঠতে যাব। এমন সময় হাসনাত দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হল। বলল, কাল অফিসে আসবেন না। কাল অফিসে আসবেন না।

বাসটা শব্দ করে ছেড়ে দিল। হাসনাতের কথাগুলো হুমকি না আমার প্রতি সাবধানবাণী বুঝতে পারলাম না।

বাড়িতে যথেষ্ট জ্বালাতন করে হামিদার ব্যাধিপর্ব এগিয়ে চলল।

হামিদার খবর নিতে এসে আনোয়ার সাহেব মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে পড়েন। তবু উনি থাকলে হামিদার মেজাজ একটু হাল্কা হয়। আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে ভালভাবেই কথাবার্তা বলে। আনোয়ার সাহেব ওকে বোঝান, দেখত মা, তুই পড়ে আছিস এমনি করে আমাদের জামাই বাবাজীবনের কত কষ্ট বলতো?

হামিদা শান্তভাবে বলে, কে ওকে বলেছ আমার কাছে বসে থাকতে?

আনোয়ার সাহেব আপত্তি করে বলেন, যাক। তুই ভাল হয়ে ওঠ আগে।

কেন? মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে হামিদা। বলে, তোমাদের নেচে বেড়াতে কে বারণ করেছে? আমার কাছে বসে থাকতে কে তোমাদের মাথার দিব্যি দিয়েছে?

সাবিত্রী এক গেলাস হরলিকস তৈরি করে নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। আগুনে যেন ঘি পড়ল। হামিদা রেগে গিয়ে ওকে এমন তেড়ে গেল যে বেচারির হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল। ঘরময় হরলিকস ছড়িয়ে সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। হামিদা ক্রোধে উন্মত্ত। আনোয়ার সাহেব অনেক সাধ্য-সাধনায় বহুকষ্টে ওকে শান্ত করলেন। হামিদা তারপর আর কিছুই খেল না। মাথা নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, আমার খিদে নেই, আমি খাব না।

সুলতানা এসেছিল ও সব কিছু দেখে বিরক্তিতে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করার কাজে সাবিত্রীকে সাহায্য করে। বুঝতে পারে না হামিদার এরকম ব্যবহারের কারণ কী? ওর সামনে এসব ঘটনা ঘটায় নিজেকেই সুলতানা অপমানিত বোধ করে। হামিদা কী মনে করে নিজেকে—সাবিত্রী কাজের লোক, তাই বলে প্রতিপদে ওর ওপর এমন নির্দয়, দম্ভপূর্ণ তাচ্ছিল্য ব্যবহার করবে? এ তো স্বভাবজাত বিষয় নয়, এ তো ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান করা। সুলতানার মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হামিদার এই কর্কশ ব্যবহারে আনোয়ার সাহেব কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। হামিদার এই ব্যবহারের জন্য ওর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে পারেন না। অথচ নিজের মেয়েটির উপরে উৎপীড়ন নিঃশব্দে সহ্য করাটাও তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। উৎকণ্ঠিত হয়ে শেষকালে বলে ফেললেন, যাও তো মা ওদিকে জামাই বাবজীবন বোধহয় চা-টা খাবে দেখ গিয়ে। আমি একটু এখানে বসছি।

সাবিত্রী সুলতানাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। বলে, আসুন দিদি।

দিদির সান্নিধ্যে সে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। সুলতানা নীরবে ওকে অনুসরণ করে।

রান্নাঘরে চায়ের জল চাপিয়ে সাবিত্রী সুলতানাকে বলে, দিদির যে কী হয়েছে, কে জানে? আমি বোধহয় আর এখানে টিঁকতে পারব ন। খেঁচিয়ে খেঁচিয়ে আমায় মেরে ফেলবে।

সুলতানা হাসে। বলে, একটু যদি অসুখ হল, তো বাড়ি মাথায় তুলছে।

চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে সাবিত্রী বলে, আপনি বেশ মানুষ, আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। এ বাড়িটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

সাবিত্রীর সরলবুদ্ধিতে সুলতানা নিজেকে এ বাড়ির একজন ভেবে হেসে ওঠে। বলে, যাও তপনবাবুকে চা দিয়ে এস।

জামাইবাবুর জন্য দুঃখ হয়।

কেন বল তো? সুলতানা সাবিত্রীর কাছে জানতে চায়।

মুখে কিচ্ছু বলেন না। চুপচাপ কম্পিউটারে বসে কাজ করে যাচ্ছেন।

তপনবাবু মানুষটি বুঝি খুব ভাল?

খুব ভাল। দাঁড়াও চা-টা দিয়ে আসি।

সাবিত্রী আমাকে চা দিয়ে যায়। ওকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার দিদিমণি উঠেছে?

সাবিত্রী বলে, না।

জিজ্ঞাসা করি ঘুমিয়ে আছে?

সাবিত্রী উত্তর দেয়—না।

সাবিত্রী চলে যায়। হামিদার ব্যাপার স্যাপার বুঝতে পারি না। ওর জন্য আনোয়ার সাহেবও কষ্ট পাচ্ছেন। উনি এখন এ বাড়ির অভিভাবক হয়ে গিয়েছেন। উনি না থাকলে আমার খুব অসুবিধা হত। উনি আসছেন বলে আমি একটু হাঁফ ফেলতে পারছি। হামিদার কাছে গিয়ে বসলে তো আমার উপরে ও রেগে যাচ্ছে।

সাবিত্রী আমাকে চা দিয়ে ঘর থেকে বের হতেই সবিস্ময়ে দেখল একখানা শাল গায়ে দিয়ে হামিদা শোবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সাবিত্রী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ও কি! জ্বর ছাড়তেই উঠে এসেছ!

হামিদা বলে, হ্যাঁ এসেছি। শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। আমি শুয়ে থাকব আর তোমরা গল্প করবে, খুব মজা না?

হামিদার স্বাভাবিক ব্যবহারে আশ্বস্ত হল সাবিত্রী। সুলতানার মনে কিন্তু আশংকা তৈরি হল। সে তাই চলে যেতে চাইল। হামিদা ওর হাত ধরে বলল, পালাতে চাইছিস কেন? তপনবাবুর গল্পটা শুনে যা!

সুলতানা ভিতরে ভিতরে খুব লজ্জাবোধ করল। মুখে কিছু বলল না। হামিদা ওকে জোর করে বসাল। বলল, চলে যাচ্ছিস কেন? শুনতেই তো চাইছিলি।

সুলতানা বসল। সাবিত্রী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। দৃশ্যটা উপভোগ করতে করতে হামিদা কথা শুরু করল। বলল, হ্যাঁ রে, তোর টিউশনি বন্ধ করে দিয়েছিস?

সুলতানা মাথা হেলিয়ে বলে, না।

আজকাল তো শুনছি স্কুল মাস্টারদের আর টিউশনি করতে দেবে না। তোর তো এবার খুব পোয়াবারো।

এসব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলতে সুলতানার ইচ্ছে ছিল না। ও চুপচাপ বসে থাকে।

আমি আর দাঁড়াই না। অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। অফিসে গিয়ে দেখি —গেটের সামনে একটা কাপড়ের ব্যানারে বড় বড় করে লেখা ধর্মঘট পালন করুন। পাঁচ দফা দাবিতে ধর্মঘট। স্ট্রাইক! হয় দাবি মানতে হবে, নইলে তালা ঝুলবে।

অফিসের সকলে আমাকে দেখে বেশ অবাক হল। কৌতূহলের সঙ্গে তারা দেখতে লাগল আমি কী করি। ওদের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। গোটা গেট জুড়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে কেবল নর্মদাবাবুকে দেখলাম না। দেখলাম শ্যামাপদ একজনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসে হাসনাত। একটা গুঞ্জন উঠল।

পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে বললাম, রাস্তাটা ছাড়ুন।

চিৎকার করে একজন বলে উঠল, কেন?

বললাম, ভেতরে যাব।

আপনি জানেন না স্ট্রাইক?

জানি। তবু আমাকে যেতে হবে।

অনেকগুলো কণ্ঠস্বর এলোমেলো ছড়িয়ে গেল। তবু আপনাকে যেতে হবে?

আপনি আমাদের একজন নন?

আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান?

এইভাবে শোষিত হতে আপনার লজ্জা করে না?

বড়কর্তা অন্যায় করছেন।

বড়কর্তা স্বেচ্ছাচারী! ওঁকে সমর্থন করা অন্যায়!

দালাল কোথাকার!

আরও কতগুলো গালাগাল উড়ে এল আমার দিকে। মনে হল কানে আঙুল দিই। বুকের মধ্যে ঢেঁকি পড়ার মতো শব্দ হল। ভাঙা স্বরে মরিয়া হয়ে বললাম, আমায় একবার যেতে দিন।

একরকম জোর করেই ঢুকে পড়লাম। পিছনের গুঞ্জন উচ্চকিত হয়ে উঠল। জোরে জোরে পা ফেলে উপরে উঠলাম। লিফট বন্ধ।

চেম্বারে একা চুপচাপ বসে বড়কর্তা। আমাকে ঢুকতে দেখে গম্ভীর মুখে প্রসন্নতার আলো জ্বলে উঠল। তিনি হাসিমুখে বললেন, এসো, এসো। আমি জানতাম তুমি আসবে।

ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত বোধ করি। কাঁপা কাঁপা হাতে বুক পকেটে রাখা খামটা বাড়িয়ে দিই। কপালে আমার ঘাম জমতে শুরু করে দেয়।

ভ্রূ কুঁচকে অবাক স্বরে বড়কর্তা বললেন, কী এটা?

অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বললাম, স্যার আমি রিজাইন করছি। এটা আমার রেজিগনেশন লেটার।

দুর্বোধ্য কিছু দেখার মতো করে আমার দিকে তিনি তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। হোয়াট, এর মানে কী?

একটা ছোট্ট শ্বাস পড়ল। বললাম, অনেক ভেবে দেখলাম স্যার, এখানে আমার চাকরি করা হবে না। সেইজন্যেই—

কেন? কোথাও কি ভাল অফার পেয়েছ?

না স্যার।

তবে?

আমি আর দোটানায় থাকতে পারছি না স্যার।

হুঁ। কিন্তু যতদিন অন্য কোথাও কিছু না পাচ্ছ, এখানে লেগে থাকতে পারতে।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণভাবে বললাম, না স্যার। সেটা আর সম্ভব নয়।

বড়কর্তা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। আমাকে দেখলেন। আস্তে আস্তে বললেন, নতুন সংসার শুরু করেছ, হুট করে এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে তোমার?

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ইমোশনটাই বড় করে দেখলে, জীবনে ইমোশনের কী মূল্য আছে—যদি না টাকা থাকে? এই আমাদের পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে প্রতি সেকেন্ডে ১৮ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। আমরা এই এখন যে বসে কথা বলছি এখনও। আসলে একটা ছুটন্ত মহাকাশযানের পিঠে আমরা বসে আছি। এ পৃথিবী তার মায়ার বাঁধনে কাউকে ধরে রাখতে পারেনি। আমাদের আবেগ অনুভূতি, ঈর্ষা, ক্ষোভ কোনও কিছুই আমাদের মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে টিকে থাকবে না। তাই খুব বেশি আবেগপ্রবণ বা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে কোনও লাভ আছে কি? কিছু মনে কোর না, তুমি বলেই এতগুলো কথা বললাম।

সে তো বুঝি স্যার। তবে আজ আমি ভারমুক্ত হতে চাই। কৃতজ্ঞতা নামের পাথরটাকে আর আমি বইতে চাই না।

বড়কর্তা যেন একটা কিছুতে ধাক্কা খেলেন। আস্তে করে বললেন, আই সি। কিন্তু তোমার পাওনাগণ্ডা কিছু আজ তো তোমায় দিতে পারব না।

বড়কর্তা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। আর কিছু বললেন না। বেশ কুণ্ঠার সঙ্গে বললাম, স্যার, আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

বড়কর্তা উঠে দাঁড়ালেন। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড। উইশ, উইশ ইউ অল দি· বেস্ট।

তিনি আমাকে অফিসের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন।

আমি তাঁকে নিষেধ করতে চাইলাম। বললাম, তা হয় না স্যার। আপনি বসুন।

তা হলে তুমি আর একদিন এসো। তোমার যা পাওনা আছে, মনে করে নিয়ে যেও।

হ্যাঁ স্যার। গুড বাই।

গেট দিয়ে বের হতেই অফিসের মানুষগুলোর গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা ওদের যেন বিশ্বাসই হয় না। ওদের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসি, তারপর বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করি।

হাসনাত পিছনে দৌড়ে আসে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কী হল? চলে যাচ্ছেন যে? অফিস যখন করলেনই না তখন আসুন আমাদের সঙ্গে। তারপর একটু দম নিয়ে বলল, আমি জানতাম স্ট্রাইকে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ওদের সঙ্গে এ নিয়ে আমার ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আস্তে আস্তে বললাম, এবারে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না। হয়তো সামনের বার পারব। চললাম, আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না!

এগিয়ে যাই। রাস্তায় চলা অজস্র মানুষের মধ্যে একটা বিন্দু হয়ে মিশে যাই। হাসনাত হয়তো পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে—কি উটকো লোক রে বাবা!

গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। একটা ফাঁকা সার্কুলার রেল চলে গেল। গঙ্গার ধারে এখন সৌন্দর্য ফেরানোর নানা কাজ চলছে। এই রেলগাড়িটা একটা বেমানান এক্কাগাড়ির মতো চলাচল করে। শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মের ওপর পা দুটো যেন আর ঘরমুখো হতে চায় না। কোথায় কার কাছ যে সান্ত্বনা চাইব, কার কাছে যে পরামর্শ চাইব—তেমন কোনও হদিস নেই আমার সামনে। আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে চাইলাম।

যার কেউ নেই, তার হয়তো এই আকাশ আছে। এই শহরে রাস্তা আছে। এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম আছে। কত লোক যে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকে। ফ্লাইওভারের নিচে কত সংসার ভাঙছে-গড়ছে। আজকাল আবার এদের গোনবার জন্য সরকারি লোক রাতের বেলা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের উন্নতির জন্য বিশ্বময় বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ঘুরে বেড়ায়। কত প্রতিষ্ঠান চাঁদা পাঠায়। তবু বছর বছর এদের সংখ্যাই দেশে বেড়ে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে এদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ইস্কুল আছে। হাতের কাজ শেখানো হয়।

কে?

প্ল্যাটফর্মে চলতে চলতে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। একটা ধাক্কা লাগতেই চমকে উঠি।

কে?

অসুস্থ নাকি? এভাবে প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে? কে লোকটা?

এই! কে তুমি? এভাবে পড়ে রয়েছ কেন?

মাথা নিচু করে দেখতে যেতেই কেমন সন্দেহ হল। চেনা চেনা চেহারা—হলধর।

আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। মদের গন্ধে বমি উঠে আসে। আশ্চর্য ব্যাটা মদ খেয়ে এখানে শুয়ে আছে? খেয়ালও নেই যে এখানে মানুষ চলাচল করছে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। কী বলব, ওকে কোনও সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। নির্মেঘ আকাশে চিল ওড়ে গোল হয়ে। বেলা পড়ে আসছে, প্ল্যাটফর্মের শেডটার ছায়া ক্রমশ বড় হচ্ছে। রোদের শেষ আভাটুকু মুছে যাবে আর কিছুক্ষণ পর। চলমান ছায়াছবির মতো মানুষের আনাগোনা ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে। বাড়ি ফেরার তাগাদা সবার মনে রঙমশাল জ্বেলে দিয়েছে। কেবল আমার মতো, হলধরের মতো কিছু মানুষ আছে যাদের মনে আলোর প্রদীপ নিভে গেছে। এই প্ল্যাটফর্মে কত উষ্ণতা ভরা দুপুর অতিবাহিত হয়েছে হামিদার সঙ্গে। সেই সব স্মৃতি এখন গভীর ক্ষত যন্ত্রণার মতো মনকে ঝলসিয়ে ক্লিষ্ট বেদনাতুর করে তুলছে। বিস্মৃতির স্বপ্ন কুহেলিকার মতো আচ্ছন্ন করে তুলছে মনকে।

মানুষের মনের অন্তস্থলে কোথায় বুঝি এক অদৃশ্য অন্তর্লোক আছে। সেখানকার সন্ধান সে নিজেই সব সময় রাখতে পারে না। রাখবার চেষ্টাও করে না। কিংবা এই খবর রাখবার চেষ্টাটাই হয়তো ভাবে পণ্ডশ্রম। কিংবা হয়তো সেইটুকুই তার একান্ত

গোপন সম্পদ। সেই সম্পদটুকু গোপনে পুষে রেখেই সে বুঝি তৃপ্তি পায়। তুমি আমার স্ত্রী হও আর স্বামীই হও সেখানে তোমার প্রবেশ নিষেধ। সেখানকার খবর কেউ জানতে পারবে না। যতদিন বাঁচব ততদিন সেটুকু আমার। আর কারও নয়। আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ দিয়ে তাকে আমি আমার অন্তরে লালন করব। সে তুমি হাজার প্রশ্ন করলেও আমি কোনও উত্তর দেব না। হলধরের কথা, শোভনার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না তুমি। তেমনি জানতে চেও না পৃথার কথাও।

কিন্তু সঞ্জয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা। একান্ত গোপন খবরগুলো কেমন করে জেনে ফেলেছিল। কবে একদিন সঞ্জয়ের কাকা কেমন করে নিজের অগোচরে অন্তরের অনুরাগটুকু দিয়ে শোভনার অস্তিত্ব নিরাপদ করে দিয়েছিল। জীবনের এক অনিবার্য সন্ধিক্ষণে শোভনাকে ঢুকতে হয়েছিল সঞ্জয়দের বাড়িতে, আর ভাগ্যবিধাতার অমোঘ নির্দেশে আমাকেই আবার সেই দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয়েছিল। আর হলধর? আর হলধরই বা এত জায়গা থাকতে সেদিন সেই রাত্রে শোভনাদের বাড়িতে বর হিসাবে উপস্থিত হবে কেন? হয়তো হাজির না থাকলে শোভনা, হলধর সবার জীবনটাই সুখের হতো।

কিন্তু তা হয়তো হবার ছিল না।

বাড়িতে বসে থেকে থেকে বিরক্ত লাগে আজকাল। হাতের ডিটিপি যা কাজ ছিল সামান্য তাও শেষ হয় গেছে। হামিদার অসুস্থতা বেড়েই চলেছে। হঠাৎ বাড়িটাকে দেখলে মনে হয় যেন খাঁ-খাঁ করছে। ছাদের ওপর এক গাদা পায়রা বাসা বেঁধেছে। পাঁচিলের ইটের ফাঁকে শ্যাওলা, কত রকমের বুনো গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ফাটলে ফাটলে। বিচিত্র বুনো ফুল সব। অযত্নে ফুটেছে। অথচ টবের গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম গাছগুলোর একটু যত্নআত্তি করা দরকার। একদিন উঠোনের নোংরা পরিষ্কার করলাম। গাছগুলোর শুকনো পাতা ফেলে দিলাম। গোড়াগুলো খুসে দিলাম। এটুকু করতেই ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠলাম। গায়ের ঘাম মুছছিলাম। একটা নতুন মোটর সাইকেল এসে দরজায় দাঁড়াল। দেখি মোবিন ভাই এসেছে। বলল, দুলাভাই কী করছেন? শুনলাম বুবু'র নাকি জ্বর হয়েছে?

তসলিম জানিয়ে ওর গাড়ির কাছে গেলাম। মোবিন ভাই হেসে বললেন, বাকি আর কিছু রাখলেন না দেখছি!

হাসি মুখেই জবাব দিলাম। সবই ধরতে হয়, বাকি কিছু না রাখাই তো ভাল। আপনার তবিয়ত কেমন? কবে এলেন এদেশে?

আমার ঘর্মাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে মোবিন ভাই বললেন, এঃ একেবারে নেয়ে উঠেছেন যে।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছি। হেসে বলি, আপনি কি বেড়াতে বেরিয়েছেন?

মোবিন ভাই বলে, হ্যাঁ। গাড়িটা নতুন কেনা হল। আপনাকে ক'দিন দেখতে পাইনি। শুনলাম বুবু-র জ্বর হয়েছে তাই জানতে এলাম। এখন আসি।

দাঁড়ান আমিও যাব আপনার সঙ্গে। চটপট হাতমুখ ধুয়ে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে ওর পেছনে চেপে বসলাম। আমার এই অভাবনীয় আচরণে মোবিনভাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ কি এ বেশে আপনি কোথায় যাবেন?

স্টার্ট দিন না, চলুন বেড়িয়ে আসি আপনার সঙ্গে।

মোবিন ভাই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। বলেন, না না, আমি এখন একলাই যাই।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

মোবিন ভাই হয়তো বুঝতে পারেন, অথবা আন্দাজ করেন আমি কিছু হয়তো বলতে চাই। তাই হয়তো এড়িয়ে যেতে চাইছেন। বলেন, আমি গাড়িটা চালাব বলে বের হয়েছি—এখন!

শান্তভাবে বলি, সে তো আমি জানি। তাই তো বলছি চলুন আপনার গাড়ি চালানোও হবে আবার আমার কথা বলাও হবে।

মোবিন ভাই হেসে জবাব দিলেন, আপনার কথা এত হালকা যে গাড়ি চালাতে চালাতে কথা হয়ে যাবে? বেশ তবে তাই চলুন।

দেখুন আমরা শিক্ষিত মানুষ বলে নিজেরা বড়াই করি তো?

হ্যাঁ। কেন?

তাহলে সংসারের কোথাও পান থেকে চুন খসলে আমাদের উচিত তা মেরামত করা নয় কি?

হ্যাঁ। অবশ্যই। আপনি কী বলতে চাইছেন বলুন তো?

না। আমি কিছু বলতে চাই না। জানতে চাই। জানতে চাই সংসারে থেকে একটু আমোদ প্রমোদ করা কী খুব দোষের?

না। তবে আমোদটা কি প্রকারের?

আমোদ! নিরামিষ আমোদ। সংসারে সবাইকে নিয়ে।

সে তো ভাল। কিন্তু তা যদি সংসারে কাউকে আঘাত দিয়ে ফেলে অযাচিতভাবে, তাহলেই সেটা দোষের।

স্বীকার করি সেটা দোষের। তাহলে সেই অপরাধের কোনও ক্ষমা নিশ্চয় হয়।

আমি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ি। মোবিন ভাই ইচ্ছেমতো পথে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয়। গাড়ি ছুটছে কুলপীর দিকে। পথে এক জায়গায় পানের দোকানে সিগারেট কেনার জন্য মোবিন ভাই গাড়ি দাঁড় করাল।

সিগারেট প্যাকেটটা খুলে একটা নিজের মুখে ধরে আর একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নিন একটা খান জন্মটা সার্থক করুন।

বললাম, সিগারেট আমি খাই না। কখনও এক আধবার খেয়েছি। ভাল লাগে না।

আহা এটা খেয়েই দেখুন না।

খেয়ে আর দেখব কি? পুড়ে তো ছাই হয়ে যাবে। দেখব তো শুধু ধোঁয়া। ও আপনি টানছেন দেখতে পাচ্ছি ভালই।

অগত্যা মোবিন ভাই প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিলেন। দেশলাই জ্বেলে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

বললাম, রোদে রোদে কোথায় ঘুরবেন? চলুন না কোথাও বসি।

ত্রস্ত স্বরে মোবিন ভাই বললেন, না না, গাড়িটা ট্রায়াল রান করে আসি।

মনে হল এখনও উনি আমাকে এড়াতে চাইছেন। তাই বললাম, তাহলে আপনি যান। আমি এবার ফিরে যাই।

হাঁটতে থাকি। কথাটা যা বলতে চাইছিলাম বলা হল না। আর কত গোপন করব? কথাটা কারও সাথে আলোচনা করা ভীষণ জরুরি। অথচ এই মুহূর্তে আর কারও কথাই মনে আসছে না।

লম্বা সার বেঁধে উপরে উঠে যাওয়া সুপুরি গাছগুলোর নিচে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে খুব ক্ষুদ্র অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। এই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে আমার কোনও বন্ধু নেই।

টাকা-পয়সা দরকার, পুরনো অফিসে একগাদা টাকা পাওনা আছে আমার। সেগুলো তুলব বলে অফিসে এলাম। অফিসে পৌঁছতেই শ্যামাপদ হাঁ হাঁ করে তেড়ে এল।

তপনবাবু আপনি অফিসে ঢুকবেন না। বড়কর্তা মানা করে দিয়েছে।

মানা করে দিয়েছে মানে?

শ্যামাপদ আমাকে এক কোণে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে বললে, আপনি রিজাইন দেবার পর একদিন অফিসে পুলিশ এসেছিল।

পুলিশ কেন?

শুনলাম আপনাকে ধরতে।

ধরতে মানে? আমি কী করেছি?

তা তো জানি না। তবে পুলিশের সঙ্গে বড়কর্তার যা কথা হচ্ছিল তাতে মনে হল—আপনি নাকি কোম্পানির অনেক গোপন তথ্য চুরি করেছেন।

আমি?

অবাক হয়ে গেলাম। আমি যে চোর একথা কে তৈরি করতে পারে! ভাল করে চিন্তা করতে লাগলাম। এরকম ঘটনার কারণ কী? অফিসে বেশি কথা যা কিছু হতো তা প্রায় সবই শ্যামাপদর সঙ্গে অথবা ওর উপস্থিতিতে। সুতরাং আমি যে কী তা ওর থেকে বেশি আর কেউ জানে না।

শ্যামপদকে জিজ্ঞেস করি আমি কি একবার বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করব?

মাথা খারাপ হয়েছে আপনার? বড়কর্তা আপনাকে পুলিশে দিতে চান। আমাকে বলে রেখেছেন, আপনি এলেই যেন তাঁকে খবর দিই। আপনাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখি তাই, অন্য লোক হলে এত কথা বলতাম না। বড়কর্তাকে গিয়ে চুপিচুপি খবর দিয়ে আসতাম।

তাহলে আমি এখন কী করি?

এখান থেকে পালিয়ে যান। আপনার ভাবনা কী? আপনি লেখাপড়া জানা মানুষ। আমাদের মতো ছোটলোকদের সঙ্গে চাকরি পোষাবে কেন? একটা ভাল দপ্তরে কাজ নিন। আর সেই সঙ্গে আমারও একটা ব্যবস্থা করে দিন।

মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। অনেকগুলো টাকা পেতাম। শ্যামপদ ঠিক কথাই বলেছে—এ হচ্ছে ছোটলোকের অফিস।

তাহলে আমি আসি।

হাঁ। এই দিক দিয়ে যান। আমার কথাটা মনে রাখবেন।

শ্যামাপদর চোখ ছলছল করে উঠল। বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা আমায় অনেকটা এগিয়ে দিল। মিছিমিছি আসাটাই সার হল। বড়কর্তার চেহারাটা ছিল অসুরের মতো,

কিন্তু মনটা মনে হতো কোমল। চাকরিটা ছেড়ে দেবার সময় কি দুঃখটই না দেখিয়েছিল। আর আজ কী শুনলাম। সংসারে বুঝি এরকমই হয়! আর হয় আমার ক্ষেত্রেই? শ্যামাপদ যা বলল, সব সত্যি তো? নাকি ওর নিজের ঝালটা মিটিয়ে নিল? শ্যামাপদ আমার কাছে যখন কাজ করত তখন কথাবার্তায় এমন ব্যবহার করত যেন সে আমাকেই তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু আমি তো ওর কোনও ক্ষতি করিনি! তাহলে?

সমাজে এক-একজন মানুষ থাকে যারা নিঃশব্দে নিজের কার্যসিদ্ধি করে যায়। এরা আড়ালে থাকতেই ভালবাসে। আড়ালে থেকেই সব লক্ষ্য করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এদের থাকে, তবে তা অন্য কারও ক্ষতি করে নয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা অন্যের সর্বনাশ করে না। এদের মনোভাব—অন্যে যদি বড় হয় তো হোক না। তাতে যেন আমার বড় হওয়াটা বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

সকলেই তো নিজের উন্নতি চায়, কাকে কখন ধরলে নিজের উন্নতিটা অব্যাহত থাকবে সেটা যে লোক বিচার করে চলতে পারে ; সেই এ সংসারে করিতকর্মা লোক বলে পরিচিত হয়। শ্যামাপদ বোধহয় এরকমই একজন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বড়কর্তা কী করে সন্দেহ করল আমায়? কী করে জানতে পারল কোম্পানির তথ্য চুরি করেছি আমি? আমি তো এসব কিছুই জানি না। শ্যামাপদই অফিসের কথা গল্প করে শোনাত। অফিসের কথা যেটুকু জানি তা ওই ওর কাছ থেকেই শোনা।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ফিরলাম। ফিরে দেখি বিছানার ওপর অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছে হামিদা। গায়ের ওপর চাদর ঢাকা। সুলতানা সামনে ঝুঁকে হালকা বাতাস করছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে ওঠে। বলে, আপনি এসে গেছেন, আমার বড় ভয় করছে।

ওর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। ওকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে। বিপদ আপদের মধ্যে আমি নিজেই কেমন দিশেহারা হয়ে যাই। ভারি কাজ করতে গেলে তার ঠিক রাখতে পারি না। ভুলো মানুষের মতো, বারবার ভুল করে ফেলি।

প্রায় তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞাসা করি, কী কী হয়েছে? ডাক্তার এসেছিল?

হাঁ। বলে গেলেন, জ্ঞান হারালে খবর দিতে। জ্বর এখন কমেছে। একটু আগে ঘাম হয়েছে। আমি গা মুছিয়ে দিয়েছি। এখন ঘুমোচ্ছে। পাছে ঘুম ভেঙে যায় হাওয়া করছি।

আমি কি ডাক্তারবাবুর কাছে যাব?

না। আপনি বসুন আমি যাচ্ছি।

সুলতানা কিছুতেই বসতে রাজি হল না। ডাক্তারের কাছে গেল। হামিদার কাছে বসলাম। কেমন যেন নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে হামিদা। নিস্তব্ধ ঘরের পরিবেশ।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল সুলতানা। ডাক্তারবাবু স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করলেন হামিদাকে। প্রেসার মাপলেন। আবার নতুন একটা ইঞ্জেকশন লিখলেন। সেটা আনা হলে তিনি ইঞ্জেকশনটা দিয়ে বসলেন কিছুক্ষণ।

মোতি সাহেবের অসুখের সময় এমনি রাত কেটেছিল। নিজে রাতের আবহাওয়ায় ট্রেনের বাঁশির শব্দ আর বাইরের গভীর অন্ধকারে নিশাচর পাখির হঠাৎ ডেকে থেমে

যাওয়া শুনতে শুনতে বুকের মধ্য টিপটিপ আওয়াজ শুনেছিলাম। কিন্তু এবার যেন অন্যরকম। শুধু একদৃষ্টে হামিদার দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই, কোনও শব্দ নেই।

অনেকক্ষণ পর ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, যদি ঘুম ভাঙে, খেতে চায়, তবে যেন দুধ পাউরুটি বা চা দেওয়া হয়।

সুলতানা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, এবার চলে যাবে। অনেক রাত হয়েছে। সাবিত্রী থাকবে। কোনও প্রয়োজন হলে ওকে যেন ওদের বাড়ি পাঠাই।

ঠিক আছে।

মাথা নাড়ি। রাত গভীর হয়ে আসে। দেওয়ালের কোণে দেখি দুটো মাকড়সা নিশ্চল হয়ে বসে আছে। মনে হল এ দুটোর একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী। ঘরে যে এতবড় একটা অসুখের ক্রিয়া চলছে, যেন কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। মনে হল ওরা একদৃষ্টে এদিকে চেয়ে বসে আছে। দেওয়ালে মোতি সাহেবের ছবি টাঙানো, শুকনো মালা দুলছে তাতে। কিন্তু ওর মায়ের ছবি আর ওর দাদার ছবিটা ঘরের কোথাও দেখতে পেলাম না।

ঘরটাকে এখন অচেনা মনে হচ্ছে। আমার ছায়াটাকেও অদ্ভুত মনে হল। বাতির অল্প আলোয় ছায়াটা পড়েছে। খানিকটা দেওয়ালে, খানিকটা মেঝের ওপর। বাঁকা চোরা ভাঙা একটা মানুষের মতো। বীভৎস মনে হয় ছায়াটাকে, অথচ এ আমার নিজেরই ছায়া।

ডাক্তার বলেছিল, ঘুম ভাঙলে আবার ওষুধ খাওয়াতে। এবার মনে হল—বাড়িতে ফোন থাকলে ভাল হতো। হামিদাকে চেয়ে দেখি। হয়তো জানেই না যে আমি ওর বিছানায় বসে রাত জাগছি। এক দৃষ্টিতে ওকে দেখতে থাকি। মনে হল অসুখের ঘোরে ও যেন স্বপ্ন দেখছে। মনে হল ও জ্বরের ঘোরে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। ওর মুখের কাছে কান পাতি, শোনবার চেষ্টা করি। বড় অস্পষ্ট কথা। কিছুক্ষণ শোনার পর মনে হল যেন আমার নামটা উচ্চারণ করল। কান পেতে আবার শোনবার চেষ্টা করি। না এবার আর কথা বলছে না। ঘুমোচ্ছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে হামিদা। লম্বা নিঃশ্বাস পড়ছে। চেতনার কোনও লক্ষণই নেই। এ বিশ্বসংসারে যেন ওর কেউ নেই। কোনও পিছুটান নেই—এমন ভাবে ঘুমোচ্ছে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ মনে হল হামিদা যেন জেগে উঠেছে। অল্প অল্প নড়ছে। ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠল যেন। একবার চোখ খুলতে চেষ্টা করল। মুখ দেখে যেন মনে হল ও সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তন্দ্রার ঘোরে একটু এপাশ ওপাশ করছে। এখনই চেতনা ফিরবে। অল্প আলোয় ওর দৃষ্টি যেন ঠিক জায়গায় নিবদ্ধ হতে পারছে না। তাকাবার চেষ্টা করছে।

ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এখন কেমন বোধ করছ হামি?

অনেক ভাল।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। ও হাসে। ওর হাসি আকাশে আলো হয়ে জ্বলে ওঠে। যেন একঝাঁক পায়রা কোনও একটা বাড়িব ছাদ থকে হঠাৎ আকাশে উঠে এল। দূরে অনেক দূরে তারা মিলিয়ে গেল। আকাশের অনেক উপরে

একটা বিন্দু জেগে ওঠে। একটা ঘুড়ি লটকে লটকে ভাসছে। উপরে উঠছে, নামছে। একটা বাচ্চা ছেলের হাতে লাটাই। বাবার হাতে সুতো। ছেলেটা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে আর বলছে, ভোকাট্টা-ভোকাট্টা।

বাবা এদিক-ওদিক তাকায়, ঘুড়িটাকে খুঁজে পায় না কিছুতেই। যতই খোঁজে, তার চোখে ভেসে ওঠে কেবল একটুকরো আকাশ।

জামাইবাবু—জামাইবাবু—

ধড়ফড় করে উঠে বসি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কী হল? হামিদা কেমন আছে?

দেখি সাবিত্রী আমায় ডাকছে।

কিন্তু একী? বাড়ির ভেতরে এত লোক কেন? ভয়ে আমার রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেল। তবে কি হামিদা? না, পৃথিবীতে চাদ সূর্য উঠছে না একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু হামিদা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে এ আমি ভাবতে পারি না।

কী-কী-কী হয়েছে? জিজ্ঞাসা করি।

সাবিত্রী কেঁদে ফেলে।

ডাক্তার চলে গেল।

হামিদা চিকিৎসা করার কোনও সুযোগ দিল না। ডাক্তার এসে পৌঁছনোর আগেই সব শেষ। কার্ডিয়াক ফেলিওর।

টেবিলে মাথার রেখে বসি। মনে হচ্ছে একটা বিশাল প্রান্তরে আমি বসে আছি। আমার চারপাশ দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকা জনমানবশূন্য। কোথাও একটা গাছপালাও নেই। আমার বুকের ভিতরটার মতো চারদিক শুধু খাঁ-খাঁ করছে।

সাবিত্রী আমার হাতে কী একটা গুঁজে দিয়ে চলে গেল। চোখ মুছতে মুছতে বলল, দিদিমণির বালিশের তলায় এটা ছিল।

হাতে তুলে দেখি—আমার নাম লেখা একটা সাদা খাম। হামিদার হাতে লেখা। এ তো চিঠি! তাড়াতাড়ি বার করে ভাঁজ খুলি।

আল্লাহ ভরসা

পাক জনাবেষু,

আমার সালাম নেবে। তোমার আদর-কদর আমি ভুলতে পারব না। আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে না। বে-আদবী মাফ করবে। আমি যেখানে যাব, সেখান থেকে ফেরা যায় না। আল্লাহ্ তালাই হায়াৎ, মওতের মালিক! যাবার আগে তোমার খেদমতে আমার একটা আরজি আছে। তুমি সুলতানাকে বিয়ে কোর। ও তোমাকে বোঝে। আশা করি, তোমাদের দুজনের কোনও ভুল বোঝাবুঝি হবে না। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কী করব বলো! এভাবে চলা যায় না। আমার সব অন্যায়-অপরাধ মাফ কোর। তোমাকে আমার সালাম ও দোয়া। আরজ ইতি—

হামিদা বানু

হামিদা বানু! বেগম নয়!

আমার চারপাশে এক শব্দহীন জগৎ। হামিদাকে নিয়ে গেল দাফন ক্রিয়াকর্ম করার জন্য।

নমাজের পর বয়োজ্যেষ্ঠ, সৌম্যমূর্তি, শীর্ণকায় ফকির সাহেব আমাকে ইশারা করলেন তাঁর কাছে যেতে। সালাম করে দাঁড়ালাম। সস্নেহে ফকির সাহেব আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় দিলাম। উনি বুঝলেন আমিই হামিদার স্বামী, ধর্ম ত্যাগ করিনি। বৃদ্ধ আমাকে আশীর্বাদ করলেন। দুহাত উপরে তুলে পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি মোনাজাত করলেন। অস্তমিত রবির রক্তরাগে ফকির সাহেবের মুখমণ্ডল দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মোনাজাৎ শেষ করে তিনি আমাকে বললেন, তাহলে বাবা! তোমার তো এখনও খাওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গেই বসে পড়ো, যৎসামান্য খেয়ে নাও।

আপত্তি করলাম না। বসলাম। কিন্তু খেতে পারলাম না। খেতে ইচ্ছে করছিল না। তন্দুরি রুটি, কাবাব, খোরমা, আঙুর শুধু নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লাম। ফকির সাহেব হয়তো বুঝলেন আমার মনের অবস্থা। খাওয়া দাওয়ার পর সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাবা তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি বড় বেশি আবেগপ্রবণ। খুব সাবধানে থাকবে। যদি জীবনে উন্নতির পথে যাও তো মহাউন্নতি করবে। কিন্তু যদি মন্দর দিকে নামো তো সর্বনাশের বাকি থাকবে না। তোমার মনের তেজ বড় প্রবল, খুব সাবধান। এসো বাবা! পারো যদি আবার আমার সাথে দেখা কোর। যেখানে থাকো, ইমান ঠিক রেখ বাবা। আল্লাহ'র উপর ভরসা রেখ বাবা। দুনিয়া এবং আখেরাতে ফায়দা হবে।

জ্ঞানবৃদ্ধ তাপসের কথাগুলো আমাকে চঞ্চল করে তুলল। তাড়াতাড়ি গিয়ে বসলাম বারান্দায়। এবারে কী করব, কোথায় যাব? জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে তরঙ্গ তাড়িত হয়ে খড়কুটোর মতো কেবল ভেসে চলা আমার জীবন। শান্তিময় জীবনের আশ্রয় আমার অধরাই থেকে গেল। আর নয়। এইবার জীবনের চরম ও পরম শান্তির সন্ধানে বের হব। জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। একেই বলে বোধহয় আখেরের আহ্বান। এই আহ্বান এলে সাড়া দিতেই হয়।

এখন কান্নার সময় নয়। আমি কিছুতেই কাঁদব না। কাঁদলে হামিদা নেই এই সত্য স্বীকার করে নেওয়া হবে। না না হামিদা নেই এ আমি ভাবতেও পারি না। ওই তো হামিদা শুয়ে আছে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ নারী। সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটো দিয়ে কী বলতে চাইছে ও?

ভাল থেকো?

আর পারি না। দুহাতে মুখ ঢাকা দিই। প্রকাশ্যে কাঁদতে পারি না। দু'ফোঁটা চোখের জল তবু বেরিয়ে এল। দু গাল বেয়ে মুখে এসে জিভে স্পর্শ করল। চোখের জলের স্বাদ লবণাক্ত জানতাম, কিন্তু সেই জলের স্বাদ যে এত বেশি লবণাক্ত জানতাম না।